

ফোটন

জানুয়ারী ২০২১ | নববর্ষ সংখ্যা

একটি শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন

আমাদের শিক্ষক- শাহরিন তাবাসসুম নোভা

মেডিকেলের নেপথ্যে

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ- কৌতুহল নাকি রহস্য ?

এক নজরে ২০২০

**LET THE
JOURNEY BEGINS.**

বৃত্তিশূলিক

৩০৫৫

গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চাই

আরডুইনোর পথ্যাত্রা

এক্স- জে

লিওনিডের শৃঙ্খিং স্টার

ফেটন

জানুয়ারি ২০২১। দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রধান পরিকল্পক
নুমেরি সাতার অপার

প্রচন্দ ও সম্পাদক
মোঃ তারিকুজ্জামান

উপদেষ্টা পরিষদ
মাহিয়ান মৃদুল
আবু সায়েম

নির্বাহী সম্পাদক
জানাতুল ফেরদৌস মমো
রামিসা হক চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
সামছিয়া আফরিন

সহযোগিতায়
Apar's Classroom পিয়ার রিভিউ টিম

বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য

ফেটন

জানুয়ারি ২০২১। দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদনা দল

জারীর মুহাম্মদ জুবায়ের
অদিতি দাস

জাহরা আনজুম
আশরাফি জাহান জান্নাতি
বিনিতা আগরওয়ালা

জায়েদ খান
লাবিবা সালওয়া ইসলাম
মাহজাবিন সুলতানা দিয়া
মেহেসাম রহমান

প্রচার ব্যবস্থাপনা
ইফতেখার রিমন

ডিজাইনার

জানাতুল জাকিয়া
রিফাত আহমেদ
ফাহিম ফয়সাল হক
মোহাম্মদ জুনায়েদ

বিশেষ ধন্যবাদাত্তে

মিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য

উৎসর্গ

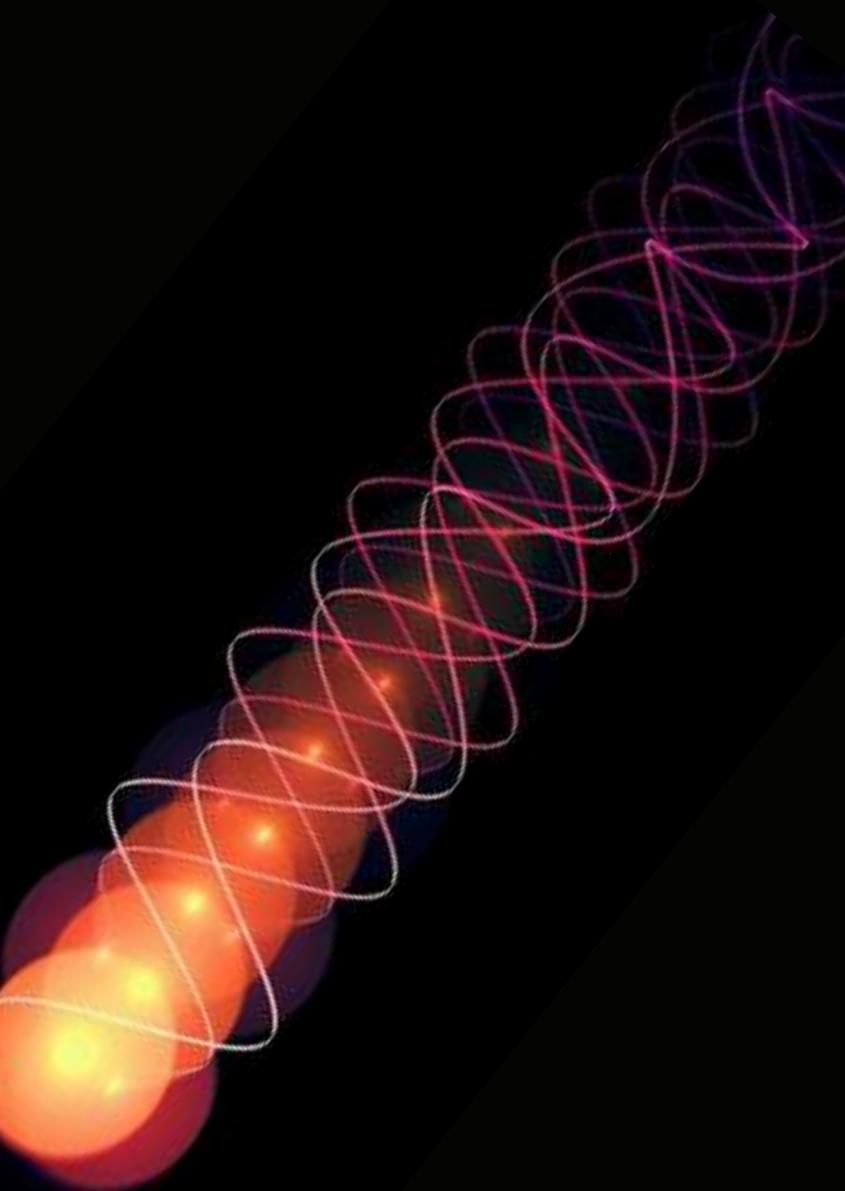
ডাক্তার, নাস্, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী,
পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ সম্মুখসারির সকল
করোনাযোদ্ধাদেরকে ।



+ THANK YOU HEROES +

মমপাদকীয়

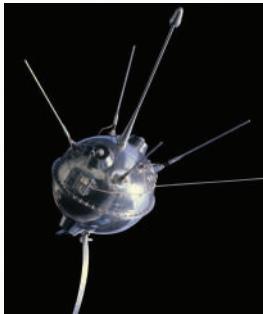
জীবন নামক চিত্র পটে তোমার অস্তিত্বের ভাঙ্গা-গড়ার নিয়ম স্মরণীয় হয়ে থাকুক ফোটন -এর প্রতিটি শব্দজুড়ে। নিজীব তুমি কে জাগাতে ফোটন, সম্মোহিত তুমি কে বাস্তবতা জানাতে ফোটন, করে পড়া অনুভূতিগুলো স্ফুরিত করতে ফোটন, ভবিতব্যের আশায় নতুন করে আশান্বিত করতে ফোটন, চিন্তাশক্তির অগ্রগতিতে ফোটন। অন্য ধাঁচের এক নেপথ্যের অংশে তুমি হবে মুকুট। নিজেকে গড়ে তোলো অজানা রাজ্যের ফোটন হিসেবে! পরবর্তী প্রজন্ম জানুক তোমার সম্পর্কে। বিকশিত হোক তোমার মেধা, তোমার শ্রম গুলো পাক পূর্ণতা, বিকশিত হোক আমাদের সমাজ, আমাদের বাংলা, আমাদের জননী। অরুণ হিসেবে জ্বলে উঠুক জাতির প্রতিটি প্রদীপ। সেই শিখা হও তুমি। ফোটন হবে তুমি ও!



এই মাঘে

১ জানুয়ারি

নিউ ইয়র্কের এলিস দ্বীপ ১৮৯২ সালে "ইমিগ্রেশন স্টেশন" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।



২ জানুয়ারি

১৯৫৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন লুনা-১ কে উৎক্ষেপণ করে। এটি সর্বপ্রথম মহাকাশযান হিসেবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে এবং চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে কল্লবিজ্ঞান ভঙ্গদের দ্বারা জাতীয় কল্লবিজ্ঞান দিবস হিসেবে পালিত।

৩ জানুয়ারি

আন্তর্জাতিক শারীরিক মানসিক সুস্থিতা দিবস।

৪ জানুয়ারি



ন্যাসি পেলোসি ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লোকসভার প্রথম নারী স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি বর্তমান স্পিকারও বটে।

৫ জানুয়ারি

২০১৪ সালে বাংলাদেশে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয় লাভ করে।



৬ জানুয়ারি



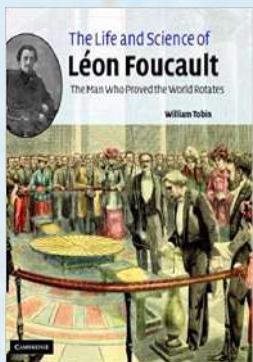
মার্কিন সিনেটর চার্লস সামনার ১৮১১ সালের এ দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাসত্ববিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন।

৭ জানুয়ারি

- ১৬১০ সালের এই দিনে গ্যালিলিও গ্যালিলি প্রথম তাঁর আবিষ্কৃত চারটি চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করেন।
- ১৯৯৯ সালে ১৩০ বছরের মধ্যে প্রথম বার মার্কিন সিনেটে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বিরুদ্ধে ইমপিচ বিচার শুরু।



৮ জানুয়ারি



- পৃথিবীর ঘূর্ণন দিবস হিসেবে পালিত। ১৮৫১ সালের এ দিনে ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী লিওন ফোকাল্ট তাঁর দোলকের মাধ্যমে পৃথিবীর ঘূর্ণন ব্যাখ্যা করেন।
- মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন একটি স্পেস প্রব লুনা-২১ ১৯৭৩ সালের এইদিনে মহাকাশের বাইরে পাঠানো হয়েছিল, যা ৮ দিন পর রিপোর্ট করে এবং নিশ্চিত করে যে বস্তুটি চাঁদে গিয়েছে।

৯ জানুয়ারি

বিশ্বখ্যাত ভূপর্যটক মারকো পোলো ১৩২৪ সালের আজকের এই দিনে মৃত্যুবরণ করেন।

১০ জানুয়ারি

পৃথিবীর সবচাইতে পুরানো পাতালরেল টিউব ১৮৬৩ সালের আজকের এইদিনে চালু করা হয়।

১১ জানুয়ারি

বিশ্ববী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে
রক্তপাতহীনভাবে মুক্তি বিজয় করেন। কুরাইশদের ক্ষমা
করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ্বে ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন
করেন।



১২ জানুয়ারি

সর্বপ্রথম সবচেয়ে দূরবর্তী রেডিও বার্তা পাঠানো
হয়েছিল আইফেল টাওয়ার থেকে।

১৩ জানুয়ারি

৪৪টি দেশের ৯ হাজার বিজ্ঞানী জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পারমাণবিক
অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের আহ্বান জানান।



১৪ জানুয়ারি

নাসার পাঠানো ম্যাসেঞ্জার নামের মহাকাশযান প্রথম
বুধ গ্রহের অদেখা গোলাধৰ্মের ছবি তুলতে সক্ষম হয়।

১৫ জানুয়ারি

নেদারল্যান্ডের রাজধানী হেগে স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।



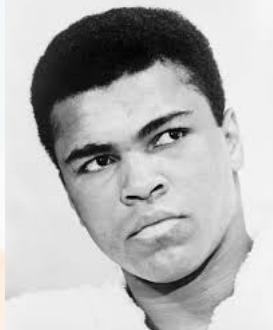
১৬ জানুয়ারি



- ১৯৭২ সালের এই দিনে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নেপাল।

১৭ জানুয়ারি

১৯৪২ সালের ১৭ই জানুয়ারী বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি-তে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রীড়ার ইতিহাসে তাঁকে শ্রেষ্ঠ হেভিওয়েট হিসেবে গণ্য করা হয়। ৬১টি বক্সিং খেলার ৫৬টিতে তিনি জয়ী হয়েছিলেন।



১৮ জানুয়ারি

কালজয়ী ইংরেজ অভিযাত্রী ও নাবিক ক্যাপ্টেন জেমস কুক হাওয়াই দ্বীপ আবিক্ষার করেছিলেন ১৭৭৮ সালের এদিনে।

১৯ জানুয়ারি

- ১৮০৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ছোট গল্লের জনক হিসেবে পরিচিত বিখ্যাত মার্কিন লেখক ও কবি এডগার অ্যালান পো জন্মগ্রহণ করেন।
- প্রথমবার আইবিএম পিসি কম্পিউটার ভাইরাস পাওয়া যায় ১৯৮৬ সালের এদিনে, যা তৈরি করেছিল পাকিস্তানের লাহোরের দুই ভাই।

২০ জানুয়ারি

- ১ ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট ২০ শে জানুয়ারি প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।
- ১ এডউইন ইউজিন "বাজ" অলড্রিন হলেন একজন আমেরিকান নভোচারী যিনি ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাঁদে পা রাখার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন।



২১ জানুয়ারি



- ১ আমেরিকান মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং জেনেটিক বিশেষজ্ঞ সলোমন স্পিগেলম্যান ১৯৮৩ সালের এই দিনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন RNA (Ribonucleic Acid)।
- ১ আমেরিকান ডেন্টিস্ট হোরেস ওয়েলস ২১ জানুয়ারি ১৮১৫ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি Surgical Anesthesia ব্যবহারের পথিকৃৎ।

২২ জানুয়ারি

- ১৯৯৯ সালে দীর্ঘ ২১ বছর পর পাকিস্তানি ক্রিকেট দলের ভারত সফর শুরু হয়।



২৩ জানুয়ারি

- জাপানী চিকিৎসক এবং পদার্থবিদ হিদেকী ইউকাওয়া ১৯০৭ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেসন কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ১৯৪৯ নোবেল পুরস্কার ভাগ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন প্রথম জাপানি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৮৯৭ সালের এই দিনে জন্ম গ্রহণ করেন।



২৪ জানুয়ারি

- ১৫৯৫ সালের এই দিনে অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ মৃত্যুবরণ করেন।
- ১৯৭২ সালের এই দিনে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

২৫ জানুয়ারি

- ১৮২৪ সালের এই দিনে বাঙালি কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৭৫ সালের এই দিনে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার কায়েম হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।



২৬ জানুয়ারি

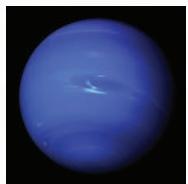
প্রতিবছর এই দিনে "আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস" পালিত হয়।



২৭ জানুয়ারি

এই দিনে সারা বিশ্বব্যাপী "International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust" দিবস পালিত হয়; যা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত।

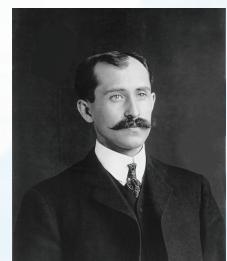
২৮ জানুয়ারি



১৬১৩ সালের এই দিনে গ্যালিলিও নেপচুনকে আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণ করে একে নক্ষত্র ভেবে লিপিবদ্ধ করেন। তাই গ্রহটির আবিষ্কারক না হলেও মিথেন-অ্যামোনিয়ায় ঢাকা গোলকটির অস্তিত্ব তিনিই প্রথম রেকর্ড করেন।

২৯ জানুয়ারি

দুর্বল নিউক্লিয় বল এবং তাড়িতচৌম্বক বলকে
তান্ত্রিকভাবে একীভূত করে নোবেল জয় করা প্রথম
মুসলিম তান্ত্রিক পদার্থবিদ আব্দুস সালাম ১৯২৬
সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।



বিমান উড্ডাবক অরভিল রাইট হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। তার
ঠিক নয় বছর পর ১৯৫৭ সালের একই দিনে ইলেকট্রোড
সম্বলিত বহনযোগ্য কৃত্রিম পেসমেকার প্রথম ব্যবহৃত হয়, যা
মূলত হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে সহায়ক।

৩০ জানুয়ারি

প্রথম মার্কিন মহাকাশচারী অ্যালান শেফার্ডের যাত্রাকে সুগম করার
লক্ষ্যে তার তিন মাস পূর্বে ১৯৬১ সালের এই দিনে চার বছর
বয়সী শিম্পাঞ্জী হ্যামকে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করানো হয়।
সুস্থভাবে ফিরে আসা হ্যামই ইতিহাসে প্রথম হোমিনিড প্রাইমেট।



মূচ্চীপত্র

এক নজরে ২০২০

জানুয়ারি স্পেশাল

নতুন বছরে নতুন উদ্যোগ

মায়েন্ড ফিকশন

এক্স - জে

গ্রেভইয়ার্ড ক্রনিকেল

নিশান - ৫৬৭৭

ফিচার

লিওনিডের শুটিং স্টার

আবেগ ও অনুভূতি

গ্রাফিন - প্রযুক্তি জগতের ভবিষ্যত

আমাদের শিক্ষক

শাহরিন তাবাসসুম নোভা

ভার্মিটি রিভিউ

মেডিকেলের নেপথ্যে

ফ্লিল ডেভেলপমেন্ট

গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চাই

ধারাবাহিক কোর্ম

আরডুইনোর পা গুলি (পর্ব - ২)

রোমাঞ্চকর

নীল নয়নে ১৭ খুলি (পর্ব - ১)

পূর্ণতায় পাঁচমিশালি

হারখানা কোথায় ?

গেমস

শব্দ ছক

গোলকধাঁধা

ধাঁধা

গল্প সাঠ

কোষকিশোর

জানার আছে অনেক কিছু

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ - কৌতৃহল, নাকি রহস্য?

এডমিশন প্রয়োগের

পদাৰ্থবিজ্ঞান

রসায়ন

গণিত

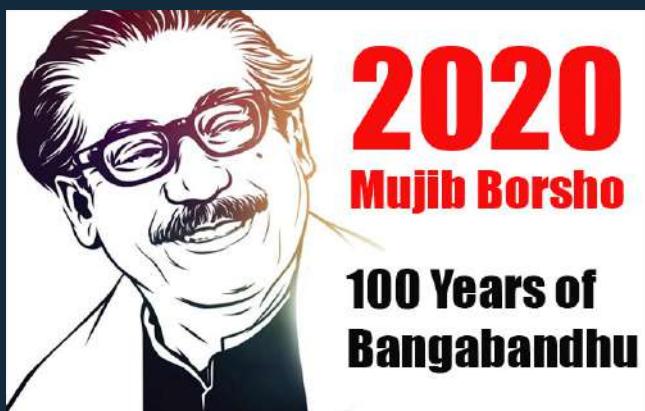
জীববিজ্ঞান

এক নজরে ২০২০

প্রযুক্তির অনেকগুলো উদ্দেশ্যের
মধ্যে একটা হলো ফোটনের গতির
কাছাকাছি গতি অর্জন করা। কণার
কথা বলছি, যেটাৰ দিকে তাঁকিয়ে
আছো, মেই ফোটন না। দু'হাজার বিশ
মালও মেই রেমে নেমে কিভাবে যেন
আমাদের হাঁরিয়ে দিল। আমরা হেরে
গিয়ে একুশে বয়ে এক মুহূর্তের জন্য
স্মার্তিচারণ করে আমি, চলো।

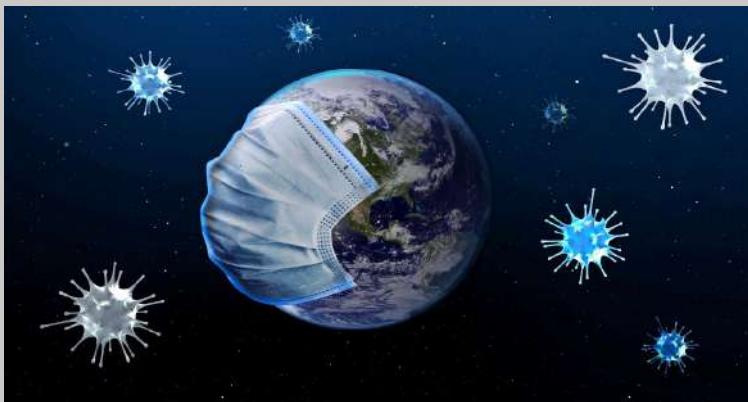
জানুয়ারি

বছর শুরু হওয়ার সাথে সাথে শুরু
হয় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা, পায়রা
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন,
১১৯-তম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্ট
ব্যবহার। বঙ্গবন্ধু বিপিএলে রাজশাহী
রয়্যালস চ্যাম্পিয়ন হয়। ইরানে
ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সোলেইমানি
নিহত হয়, ব্রেক্রিট কার্যকর হয়।
উদ্বোধন করা হয় সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপ
FAST, ১৭ বছর বয়সী স্কুলছাত্র
নাসার ইন্টার্নি হিসেবে দুই সূর্যের
একটি এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার করে।



ফেব্রুয়ারি

মাসের শুরুতে রাজশাহীতে দেশের
তৃতীয় ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধন ও
শেষে মিরপুরে ১০৬ রানের ব্যবধানে
জিব্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ চতুর্দশ
টেস্ট বিজয় লাভ করে। অনুষ্ঠি-১৯
দলও বিশ্বকাপ এনে দেয় ভারতকে
হারিয়ে। প্রথম সৌর অরবিটার
'সোলো' উৎক্ষেপণ করা হয়। WHO
কোভিড-১৯-এর নামকরণ করে।
প্রথমবার কোন বিদেশি চলচিত্র
'প্যারাসাইট' সেরা চলচিত্রে অঙ্কার
লাভ করে।



মার্চ

দেশে তিনজন করোনাভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয় এবং দশ দিনের মাথায় প্রথম মৃত্যুবরণ ঘটে। বৈশ্বিক মহামারির ঘোষণা দেয়া হয়। ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় শ্লোগান ঘোষণা; মুজিব শতবর্ষ উদ্বোধন; ৫০-তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সারা দেশ ধাপে ধাপে লকডাউন, স্থবরিতার মুখোমুখি হয়।



এপ্রিল

মাঝামাঝিতে সারাদেশকে ভাইরাস-বুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। অর্ধশত থেকে এক মাসের মধ্যে সাড়ে সাত হাজার আক্রান্ত হয়, প্রথম ডাক্তার হিসেবে ডা. মঙ্গেন কোভিডে মারা যান।

মে
মাস শেষে তিন লাখ নমুনা পরীক্ষা, অর্ধ লক্ষ আক্রান্ত, দশ হাজার সুস্থতা, অর্ধ হাজারেরও বেশি মৃত্যু হয়। দক্ষিণ উপকূলে ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ আঘাত হানে। বাবার সাথে অণুজীববিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা করোনার জিন-নকশা উন্মোচন করেন।



জুন

দেশে মাস শেষে প্রায় আট লাখ নমুনা পরিমক্ষা, দেড় লক্ষ আক্রান্ত, অর্ধ লক্ষ সুস্থতা, প্রায় দু'হাজার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এক দিনে ১৫ তারিখ সর্বোচ্চ পনেরো হাজার জন সুস্থ হন, অপর দিকে ২৯ তারিখ সর্বোচ্চ ৬৪ জন মারা যান। সারা বিশ্বে শুধু মৃত্যু পৌনে চার লাখ ছাড়ায়।



পনেরোশো বছরের পুরনো আয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়। প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, শিল্পী এন্ডু কিশোর মৃত্যুবরণ করেন।

আগস্ট

হিরোশিমার চেয়েও ৩০-৪০% বেশি শকওয়েভের রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটে বৈরুতে। নরেন্দ্র মোদি রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। রাশিয়া প্রথম দেশ হিসেবে ভ্যাক্সিন তৈরির ঘোষণা দেয়। ভাস্কর মৃণাল হক, ভারতের একমাত্র বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বিদায় নেন।



জুলাই

মাস শেষে কোভিডে সোয়া দুই লাখের বেশি আক্রান্ত, সোয়া এক লাখ সুস্থতা, তিন হাজারেরও বেশি মৃত্যু হয়। আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে একটি রূপা, পাঁচটি ব্রোঞ্জ লাভ করে বাংলাদেশ। আরব-আমিরাত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নভোযান পাঠায়।



মেপ্টেম্বর



বছরজুড়ে উদ্ভাবিত তিনুটি ব্রি-ধানের জাত, লাউ, সয়াবিন, পেঁপে, পাটশাক, রসুনের বিকল্প বিডি নিরা, পেঁয়াজের বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাত অনুমোদিত হয়। এছাড়া উন্নত হাঁস ও দেশি মুরগির দু'টি জাত, জোড়া-বাচুর উৎপাদন উদ্ভাবিত হয়। জীবজগতে দেশের চারটি উদ্ধিদ, একটি ব্যাঙের প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়।

অক্টোবর

প্রথমবারের মত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, মাধ্যমিক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ‘ধৰ্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড’ আইন জারি ও রায় হয়।



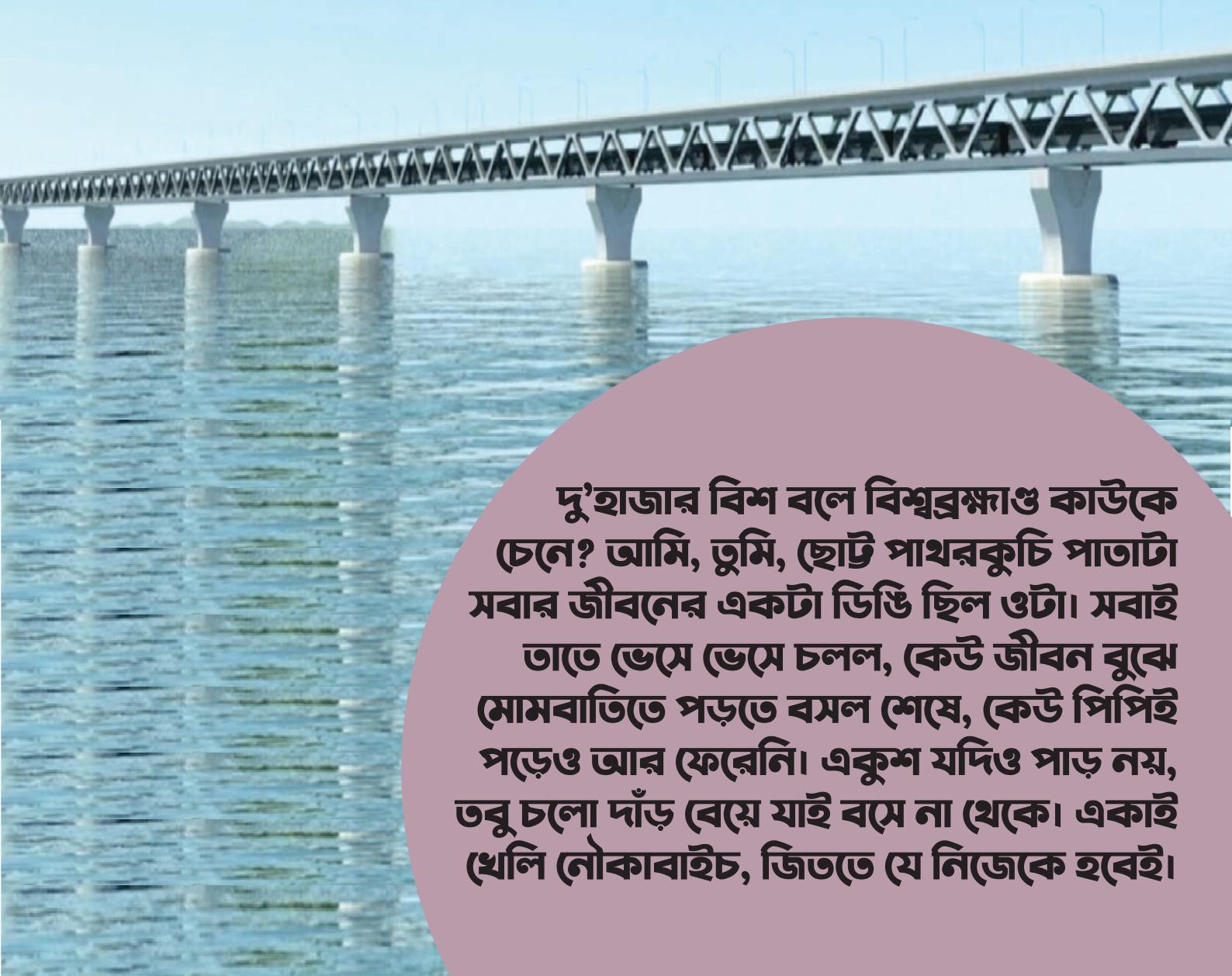
নভেম্বর

৫৯-তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হন জো বাইডেন। চীন বিশ্বে প্রথম ৬জি স্যাটেলাইট প্রেরণ করে, স্পেসএক্স প্রথম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নভোচারী পাঠায়। মুস্বাই ইন্ডিয়ানস আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়। হৃদরোগে ম্যারাডোনা এবং কোভিডে ‘ফেলুদা’ সৌমিত্র চলে যান।



ডিমেন্সুর

এ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় পনেরো লাখ মানুষ মারা যায় কোভিডে। দ্বিতীয় দেশ হিসেবে চাদে পতাকা স্থাপন করে চীন। রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ভ্যাক্সিন প্রয়োগ শুরু হয়। ৫০-তম বিজয়ের মাসে দৃশ্যমান হয় পদ্মা সেতুর ৪১-তম স্প্যান। একদল গবেষক কর্তৃক আবার বুনন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ১৭০ আংটি-গলা ঢাকাই মসলিন ভৌগোলিক স্বত্ত্ব লাভ করে। হেপাটাইটিস-সি আবিষ্কার, ব্ল্যাকহোল ও ছায়াপথের রহস্যভোগ, জেনেটিক কাঁচি ক্রিস্পার উদ্ভাবনের জন্য নোবেল দেয়া হয়।



দু'হাজার বিশ বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাউকে চেনে? আমি, তুমি, ছোটি পাথরকুচি পাতাটা মবার জীবনের একটা ডিঙি ছিল ওটা। মবাই তাতে ভেমে ভেমে চলল, কেউ জীবন বুঝে মোমবাতিতে পড়তে বমল শেষে, কেউ পিপিটই পড়েও আর ফেরেনি। একুশ যদিও পাড় নয়, তবু চলো দাঁড় বেয়ে যাই বয়ে না থেকে। একাই খেলি নৌকাবাইচ, জিততে যে নিজেকে হবেই।

নতুন বছরে নতুন উদ্যোগ

মাহজাবিন মুলতানা দিয়া

সাউথ পয়েন্ট কলেজ,
ঢাকা



প্রতি বছর আমার মতো প্রতিটা শিক্ষার্থীরই একই নিউ ইয়ার রেজোলিউশন থাকে, সেটা হলো- "এই বছর আমি ভালো করে পড়বো।" কিন্তু বছরের শেষ পর্যন্ত এটা ধরে রাখা অনেক কষ্টকর। এই কথা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?

কিছু কিছু এক্সট্রাওর্ডিনারি এলিয়েন ছাড়া এই প্রতিজ্ঞা ধরে রাখা মুশকিল বটে। কিন্তু অসম্ভব না। আমিও যেহেতু একাদশ শ্রেণিতে পড়ি, তাই আমার নিজের বিভিন্ন সমস্যা, সেই সাথে নিজের বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা বিভিন্ন সমস্যার আলোকে আমি যেটা চিন্তা করে বের করেছি তা হচ্ছে, আমাদের সমস্যাগুলো মূলত-

নিজের পড়ার জন্য আলাদা সময় না রাখা, নিজস্ব রুটিন না থাকা, সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় নষ্ট করা, নিজস্ব নোট না রাখা, একেকবার একেক নিয়মে পড়া ইত্যাদি। আমাদের প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই এসব সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। কোনো একদিন আমায় কেউ বলেছিল যে, চেষ্টার উপরই দুনিয়া কায়েম। এজন্যে চলো নিচে লেখা বিষয়গুলো চেষ্টা করে দেখি!

রুটিন করে পড়া

প্রথমেই নিজের একটা রুটিন করা উচিত। যেটাতে নিজের পড়ার সময় থাকতে হবে। নিজের পড়ার জন্য সময় না থাকলে সারাদিন শুধু স্যারদের ক্লাস করেও লাভ নেই। কারণ স্যার যা পড়ায়, এটা দিয়ে সৃজনশীল উত্তর করা গেলেও MCQ এর জন্য বই পড়তেই হবে। আর সামনে অনেকেরই অ্যাডমিশন, তাদের জন্যে তো রুটিন মাফিক কাজ করা অত্যন্ত জরুরি। নইলে কিন্তু পরে কপালে কী আছে, সেটা আর না-ই বললাম। এজন্য নতুন বছরে সবারই একটা রুটিন তৈরি করা দরকার।

পড়ার সিস্টেম ফিক্সড রাখা

পড়ার পদ্ধতি যেকোনো একটা ফিক্সড রাখা দরকার। একেকবার একেকটা ফলো না করে অনেকগুলো পদ্ধতি একসাথে নিয়ে বসে নিজের পড়ার ধরনের সাথে মিলিয়ে যেকোনো একটা ফিক্সড করা দরকার। কোনো এক আপু বা ভাইয়ার কাছ থেকে শুনে তুমি বই-ই পড়লে। কিন্তু তোমার পড়া মনে থাকে না। আবার লিখলে ঠিকই মনে থাকে। তাহলে কোনটা বেটার তোমার জন্য, লেখা না পড়া? এজন্যে মানুষের কথা না শুনে নিজের কমফোর্ট জোনকে প্রাধান্য দিয়ে স্টাডি সিস্টেম ফিক্সড রাখা দরকার।

নোট করা

প্রতিটি অধ্যায় পড়া শেষে নিজের একটা নোট করা দরকার। অনেকের আবার নিজের নোট ছাড়া পড়ও হয় না। কিন্তু আলসেমি করে নোট করে না। নোট থাকলে পরীক্ষার আগে এত মোটা মোটা বই না পড়েও পুরা বই রিভাইস করা সম্ভব। অনেকেই নিজের নোট না থাকায় পরীক্ষার আগে পুরোটা রিভাইস দিতে পারে না। যার জন্যে এক্সাম ভালো হয় না। তবে নোট করা নিয়ে অপার ভাইয়ার একটা কথা আছে, “**পরীক্ষার জন্যে না, পরীক্ষার আগের রাতের জন্যে পড়ো, পরীক্ষা এমনিতেই ভালো হবে।**”

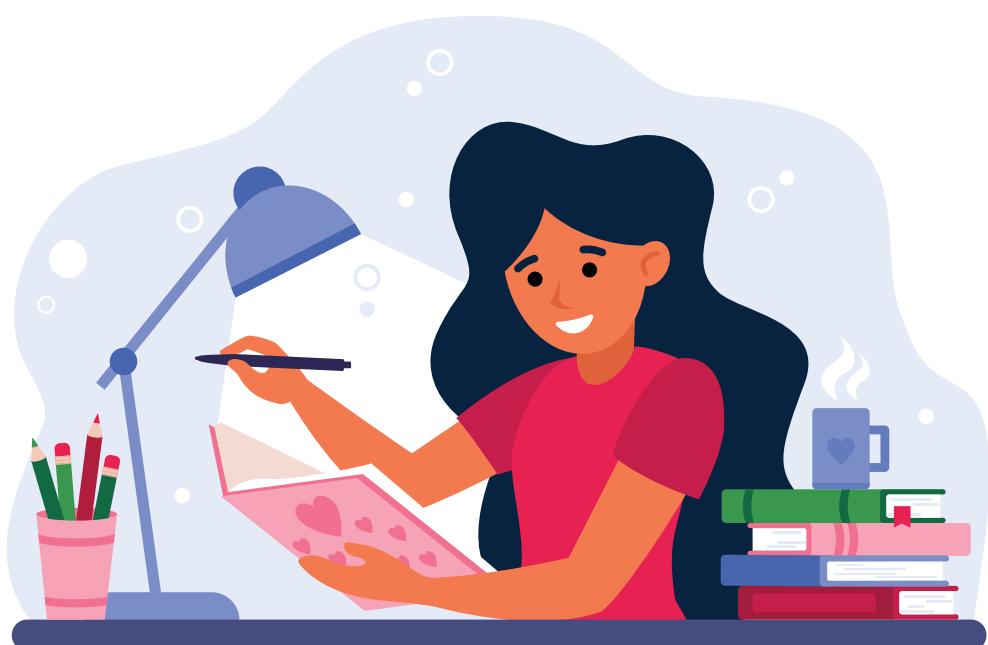
এজন্য নোট করা অনেক ইম্পট্যান্ট।

পড়ার সময় যোশ্যাল মিডিয়াতে চুনা দেয়া

পড়ার সময় যোশ্যাল মিডিয়াতে সময় নষ্ট হয়, সেটা স্বীকার করতেই হবে (এটা সম্পর্কে বেশি কিছু বলবো না, নইলে পাবলিকের ধোলাই খাওয়ার সম্ভাবনা আছে!!)। একটা কথাই বলতে হয়, পড়ার সময় আমরা যেন ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইন্সটাগ্রাম লগআউট করে রাখি অথবা নোটিফিকেশনটা অফ রাখি। তাহলে মন আর এদিক-সেদিক করবে না।

পড়ার সময় শুধু পড়া

মনোযোগ সহকারে পড়ার চেষ্টা করলে ভালো হয়। তিভি দেখতে দেখতে অথবা গান শুনে না পড়াটাই ভালো, নাহলে পরীক্ষার হলে গান মাথায় আসলেও পড়াটা আর আসবে না!



শুরুতেই প্রেশার না নেয়া

বছরের শুরুতেই প্রেশার নিলে পরে আর ভালো লাগে না। প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়ার পরিমাণ বাড়াতে পারলে ভালো হয়। এজন্য প্রেশার না নিয়ে অল্প করে পড়ো আর আস্ত আস্তে পরিমাণ বাড়াও। বছরের শুরুতেই সব এনার্জি শেষ হয়ে গেলে সারা বছর কী করবে? তাই শুরুতেই প্রেশার নেয়ার দরকার নেই। যখন দরকার তখন প্রেশার নিতে পারো। একামের আগেও প্রেশার নেবে না। এটা খুবই খারাপ অভ্যাস। তখন দেখা যাবে, প্রেশারের জন্যেই শুধুমাত্র একামটা ভালো হলো না!

পড়ার ক্ষেত্রে নিজের লাভটা আগে যাচাই করা

লকডাউনে ইদানীং সবার মধ্যেই একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সারাদিন লাইভ ক্লাস করার। বলছি না এটা খারাপ। কিন্তু এটা আসলেই তোমার কাজে দিচ্ছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। কারণ, তোমার নিজের পড়া শেষ করতেই হবে। নাহলে দিনশেষে তোমারই ক্ষতি হবে।

নিজেকে অজুহাত আর নয়

প্রতিটা মানুষ সে ছোট হোক বা বড়, তার যেকোনো কাজ আটকে থাকার অন্যতম কারণ হলো নিজেকে অজুহাত দেয়া। পরে পরীক্ষায় মনে হবে, “ইশ! যদি অজুহাত না দিয়ে আরেকটু সময় নিয়ে পড়তাম।” তাই যত কষ্টই হোক না কেন, যখনকার পড়া তখন শেষ করাই ভালো, নয়তো তুমি খরগোশ হয়েও কচ্ছপের চাহিতে পিছিয়ে যাবে।



প্রচুর বই পড়া

বই এমন একটা বস্তু যা তোমার জীবনটাই বদলে দিতে পারে। সারাদিন শুধুমাত্র পড়ার বই না পড়ে অন্য বইও পড়তে পারো। বিভিন্ন বই, যেগুলো তোমাকে আরও ভালো মানুষ হতে সাহায্য করবে, স্কিল বাড়াবে, নিজেকে জানতে পারবে- সেসব বই পড়বে। একটা মজার কথা বলি। একবার নবম শ্রেণিতে থাকতে ফিজিক্স এক্সামে অনেক আনকমন একটা প্রশ্ন এসেছিল। আমার যেহেতু অনেক বই পড়া ছিল, তাই ওই প্রশ্নটার উত্তর করা অনেক সহজ ছিল আমার জন্যে। তাই সবাই নতুন বছরে এই অভ্যাসটা তৈরি করতে পারো।

এটা তোমার পড়ার কোনও ক্ষতি করবে না, বরং তোমার পড়ালেখাকে আরও একধাপ উপরে নিয়ে যাবে।

অনেক কথাই তো বললাম। এগুলাকে এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে নিতে পারো অথবা এটাকে তুমি নিজের পরীক্ষায় ভালো করার ভ্যাকসিনও মনে করতে পারো। এরপর নিজের উপর প্রয়োগ করে দেখো, দিনশেষে লাভ কিন্তু তোমারই হবে।

সর্বশেষ কথা, নিজের শরীরের যত্ন নিও কিন্তু! নাহলে পড়ালেখা একদমই ভালো লাগবে না। আর সেটা কিন্তু হতেও দেয়া যাবে না।

এছাড়াও এরকম আরো অনেক টিপস পেতে ঘুরে আসতে পারো <https://blog.10minuteschool.com/> ওয়েবসাইটে। যেখানে পেয়ে যাবে পড়াশোনা সহ আরো অনেক অনেক টিপস।





এক্স-জে

জায়েদ খান

ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ,
টাংগাইল

আজকের দিনটা খুব ব্যস্ততায় কাটছে জেফের। একটি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিতে চাকরি করে সে। ট্রান্সপারেন্ট মোবাইল থেকে শুরু করে হিউমেনয়েড সার্ভেন্ট রোবটও বানায় তারা। তাদের বানানো সার্ভেন্ট রোবটের জনপ্রিয়তা এখন আকাশছোঁয়া। সার্ভেন্ট রোবট বানানোর প্রতিযোগিতায় তাদের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। জেফের টামের কাজ হলো এই সার্ভেন্ট রোবটের ক্রটি খুঁজে বের করা। তাদের কোম্পানির উদ্দেশ্য হলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করে তোলা। হিউমেনয়েড রোবটের মাধ্যমে তারা সেই উদ্দেশ্যই বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি কাজ করে দিবে এই রোবট।

"কয়েকদিন ধরে কিছু নিউজ পোর্টাল আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। তাদের দাবি, এসব হিউমেনয়েড রোবট নাকি মানুষকে অলস এবং কর্মে অক্ষম করে তুলচ্ছে। মানুষ মাত্রাতিরিক্ত এসব রোবটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এতে যেমন তাদের স্বাস্থ্যকুঁকি বাঢ়ছে তেমনি তারা হতাশায় ভুগছে।" তার বসের হলোগ্রামের সামনে এসব কথাগুলো বললো জেফ। বস আজ অফিসে আসতে পারেননি। তাই হলোগ্রামের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন।

"যত্তেসব মেকি কথাবার্তা। এই রোবটের ফলে মানুষের কত সময় বেঁচে যাচ্ছে তার হিসেব তাদের আছে? আর এসব নিউজ পোর্টালও কোনো নামিদামি নিউজ পোর্টাল না। এটাও তো হতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলো তাদের কোম্পানির সুনামকে প্রশংসিত করতে এসব করছে। আজকাল দেখি নিউজ পোর্টালগুলো একদম বিকিয়ে যাচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করো। আমি এর কড়া জবাব দিবো", রাগতস্বরে বললেন জেফের বস।

দুহিদিন পর-

দৌড়াতে দৌড়াতে বসের রুমের ভেতর চুকলো জেফ। "স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হয়েছে, জেফ?" চিন্তিত স্বরে বললেন বস।

"স্যার,- আমাদের সার্ভার হ্যাক করা হয়েছে। সার্ভারের সকল ডাটা মুছে ফেলা হয়েছে। তার বদলে কেউ সম্পূর্ণ নতুন এক ভাইরাস তুকিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের কাছে কল আসছে যে, আমাদের কম্পিউটারাইজড ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলো

সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর আমাদের হিউমেনয়েড রোবটগুলো তাদের কমান্ড শুনছে না। অন্তর্ভুক্ত আচরণ করছে ওগুলো", এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো সে। মাথায় হাত দিয়ে টেবিলের দিকে চেয়ে আছেন তার বস। বিরাট লোকসান হয়ে গেছে। সার্ভার ঠিক করতে না পারলে তারা দেউলিয়া হয়ে যাবে।

হঠাতে করে সামনের বিশাল গ্লাসে ব্রেকিং নিউজ ভেসে উঠলো, "অজানা এক ভাইরাসের কারণে একে একে নষ্ট হচ্ছে আর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে পৃথিবীর সব ইলেকট্রনিক ডিভাইস। পুরো পৃথিবী জুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। মানুষের জীবনযাত্রা থমকে গিয়েছে। সরকার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত....." বিপ শব্দ করে সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেলো। "হাহ, তার মানে পুরো পৃথিবীতে একই অবস্থা। আস্তে আস্তে সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পুরো পৃথিবী অচল হয়ে যাবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে", হতাশার স্বরে বললেন তার বস। "চিন্তা করবেন না, স্যার। নিশ্চয় এক্সপার্টরা এটা নিয়ে কাজ করছে। তারা খুব শীঘ্ৰই কোনো না কোনো সমাধান খুঁজে পাবে", বসকে আশ্বাস দিলো সে। "তাই যেন হয় জেফ, তাই যেন হয়। আমরা যে কতটা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ওপর নির্ভরশীল সেটা তো জানোই। এখন যদি এগুলো আর ঠিক না হয় তাহলে মানব সভ্যতা কয়েকশ বছর পিছিয়ে যাবে", বললেন জেফের বস।

অফিস থেকে বের হয়ে গাড়িতে বসলো জেফ। কিন্তু গাড়ির আটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করছে না। না করারই কথা। অবশ্য তার গাড়িটি বেশ পুরনো মডেলের। পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড না। সুতরাং চালানো যাবে। গাড়ি স্টার্ট দিলো সে। গাড়ি চালাতে চালাতে আশেপাশে তাকাচ্ছিলো সে। মানুষজন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। ক্ষুঁক জনগণ রাস্তায় মিছিল বের করেছে। তা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। "কি একটা অবস্থা!", আশেপাশে তাকিয়ে কথাটা বললো জেফ। দ্রুত বাসায় যেতে হবে তাকে। সেখানকার কী অবস্থা কে জানে।

বাড়িতে চুকে দেখলো ইলেকট্রনিক্সিটি নেই। কোনোমতে হাতড়ে হাতড়ে নিজের রুমে গেলো সে। আশ্চর্য, রোবটটা গেলো কোথায়! "এক্স-জে, কোথায় তুমি?" খুঁজতে খুঁজতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। পিছনে যান্ত্রিক একটা শব্দ শুনে যেই ঘাড়টা ঘুরিয়েছে অমনি এক্স-জে তার দু'টি হাত দিয়ে ধাক্কা দিলো জেফকে।

ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারলো না সে। উল্টে পড়ে যেতে থাকলো নিচের দিকে। বিশ্বাস করতে পারছে না সে! তার সার্ভেন্ট রোবট তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো!

সময়টা যেন থেমে গিয়েছে। সে ভেবেছিলো আধুনিক যন্ত্রগুলো মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলছে। কিন্তু সেই নিউজ পোর্টালের কথাই সত্যি হলো। যন্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার প্রমাণ আজ পেলো সে। রোবটের হাতে তার মৃত্যু হবে, ভাবেনি সে।

অনন্তকাল ধরে নিচে পড়ছে সে.....!

হড়মুড়িয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো জেফ। ঘেমে একাকার হয়ে গেছে সে। "তাহলে এটা স্বপ্ন ছিলো", চোখে মুখে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো সে। ছোটোবেলায় তার বাবার বলা কথাটা মনে পড়লো তার, "আমরা বিভিন্ন প্রকার আধুনিক ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করবো, কিন্তু এগুলো যেন আমাদের ব্যবহার না করে।"



ফ্রেটন

লিওনিডের শুটিং স্টার

রাগিব আবিদ

হলিল্যান্ড কলেজ, উত্তর বালুবাড়ী, দিনাজপুর

কী! নাম শুনে অবাক লাগছে? শুটিং স্টার মানে তো জানি, লিওনিডটা আবার কী? লিওনিড সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে শুটিং স্টার কী। আসলে শুটিং স্টার এর আরেকটা নাম আছে, যাকে বলে উল্কা।

উল্কা হলো কোন ধূমকেতুর অংশবিশেষ, যা কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে। ইংরেজিতে একে বলে ‘Meteor’।

তোমরা কি জানো, মহাকাশে পরিভ্রমণরত পাথর বা ধাতু দ্বারা গঠিত ছোট মহাজাগতিক বস্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে বায়ুর সংঘর্ষে জ্বলে ওঠলে তাকে উল্কাপাত বলে? উল্কাপাতের জন্য দায়ী বস্তুগুলোই উল্কা। উল্কাপিণ্ড গ্রহাণুর তুলনায় অনেক ছোট। আকারে এরা ধূলিকণা থেকে এক মিটার দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এর চেয়ে ছোট বস্তুগুলোকে মহাজাগতিক ধূলিকণা বলে। এসব উল্কার বেশীরভাগই গ্রহাণুর বা ধূমকেতুর অংশবিশেষ। বাকি অংশ মহাজাগতিক বস্তুর সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি ধ্বংসাবশেষ।

যখন কোন উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন এর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ২০ কিমি করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (৭২,০০০ কিমি/ ঘণ্টা; ৪৫,০০০ মাইল/ ঘণ্টা) এসময় অ্যারোডাইনামিক তাপের কারণে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটার সৃষ্টি হয়। এই বাহ্য মূর্তির কারণে উল্কাপাতকে "তারা-খসা" বা "নক্ষত্র-খসা" (shooting star/ falling star) বলে। কিছু কিছু উল্কা একই উৎস হতে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙ্গে প্রজ্বলিত হয়, যাকে উল্কাবৃষ্টি বলা হয়।

তোমরা জেনে অবাক হবে যে- প্রায় ১৫,০০০ টন পরিমাণ উল্কা, ক্ষুদ্র উল্কাকণা এবং মহাজাগতিক ধূলিকণা প্রতি বছর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।



মনে প্রশ্ন এসেছে নিশ্চয়ই,
তাহলে লিওনিড টা আবার কী?
কিন্তু লিওনিড সম্পর্কে জানতে
হলে আরেকটা বিষয় জানতে
হবে।

হ্যাঁ। ঠিক ধরেছো!
উল্কাপিণ্ড!

ভূপৃষ্ঠে পাতিত হবার পর উল্কাকে উল্কাপিণ্ড বলে। মূলত তিনি ধরনের উল্কাপিণ্ড দেখা যায়। যথা:-

১. পাথর সমৃদ্ধ উল্কাপিণ্ড, যা খনিজ সিলিকেট দ্বারা গঠিত।
২. লোহা সমৃদ্ধ উল্কাপিণ্ড, যা লোহা এবং নিকেল দ্বারা গঠিত।
৩. পাথর ও লৌহসমৃদ্ধ উল্কাপিণ্ড, যা বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ ও পাথর দ্বারা গঠিত।

বলতে পারবে উল্কাপিণ্ড আসলে কি দিয়ে তৈরি? এইতো ঠিক ধরেছ! বেশিরভাগ উল্কাপিণ্ডই পাথরের তৈরি। এদেরকে কন্ড্রাইট এবং অ্যাকন্ড্রাইট শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। মাত্র ছয় শতাংশ উল্কাপিণ্ড হচ্ছে লোহা এবং পাথর-লোহা দ্বারা তৈরি। এবার তাহলে তোমাদের কৌতুহল মেটানো যাক।

রাতের মেঘমুক্ত আকাশে অনেক সময় নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল বস্তু পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে দেখা যায়। আর তা-ই হলো উল্কাবৃষ্টি। রাতের আকাশে তারা গোনা যেমন

মজার, তেমনই মজার উল্কাবৃষ্টি দেখা।

মেঘহীন আকাশে হঠাৎ আমরা উল্কাবৃষ্টি দেখি। ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে উল্কা যখন দুষ্টুমি করে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তখন তাকে বলা হয় উল্কাবৃষ্টি বা উল্কাঝড়। দেখে মনে হবে যেন প্রকৃতি উৎসবে মেতেছে। উল্কাপাতের ঘটনাকে বলা হয় ‘ইটা-আঞ্চলিকাইডস’।

আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে পারসাইড, যা প্রায় প্রত্যেক বছরের ১২ আগস্ট দেখা যায়, তা-ও প্রতি মিনিটে একটি। এছাড়াও অন্যান্য সময় মাঝে মাঝে দেখা যায়। নাসার এক বিশেষ গণনাকারী যন্ত্র রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা প্রতি মিনিটে উল্কার সংখ্যা হিসাব করতে পারে।



লিওনিড প্রত্যেক বছরের ১৭ নভেম্বর দৃশ্যমান হয়। প্রায় ৩৩ বছর পর পর, লিওনিড উল্কাবৃষ্টি এক ধরনের উল্কাঝড় সৃষ্টি করে, যার ফলে ঘণ্টায় হাজারেরও বেশি উল্কা দৃশ্যমান হয়। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের পর লিওনিড থেকেই সর্বপ্রথম উল্কাবৃষ্টি নামকরণ করা হয়। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে উল্কাবৃষ্টি হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে, তা বিচ্ছুরিত হয়েছিল গামা লিওনিস নামের তারকা থেকে।

তোমরা এটাও জেনে অবাক হবে যে, আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বিরাট উল্কাবৃষ্টি হয় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে, যা লিওনিড নামে পরিচিত। আনুমানিক ঘণ্টায় এক হাজারেরও বেশি উল্কা পৃথিবীতে এসে পড়েছিল।

ভাবা যায়!! আসলে এই মহাবিশ্বে আরো কত অজানা সব জিনিস রয়েছে তা বের করতে হয়তো এক হাজার বছরও লেগে যেতে পারে! কে জানে, এ কথা সত্যি সম্ভব হবে কিনা। হয়তো বা বিজ্ঞানের আরো অগ্রগতির ফলে একদিন এসব সম্ভব হতেও পারে।

আজ তাহলে এ পর্যন্তই। কেমন লাগলো তা জানাতে ভুলো না যেন! দেখা হবে অন্য কোন সংখ্যায়!
আরও যদি জানতে চাও, তাহলে উইকিপিডিয়াতে ঘুরে আসতে পারো।

গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চাই

ঝংকার মাহবুব

লেখক, ওয়েব ডেভেলপার,
পাইথন ট্রেইনার



গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চাও?

ধামা-ধাম ফটোশপ নিয়ে বসে পড়লে, ফটোশপ অপারেটর হতে পারবে, গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারবে না। গ্রাফিক ডিজাইনার হতে হলে সিস্টেমেটিক্যালি ধাপে ধাপে কয়েকটা জিনিস শিখতে হবে।

ধাপ-১: তোমাকে একটু হলেও আঁকাআঁকি জানতে হবে। খুব ভালো আর্টিস্ট হওয়া লাগবে না। তবে একটু ঘরবাড়ি, গাছপালা, মুখ, হাত-পা কয়েকটা টান দিয়ে চট করে এঁকে ফেলতে পারতে হবে।

একটু একটু করে শুরু করে দাও। কার্টুন পিপল নামে বাংলায় কিছু টিউটোরিয়াল আছে সেগুলা দেখে ফেলো। ইংরেজি ভিডিও দেখতে চাইলে এইখানে সুন্দর করে কিছু ভিডিও দেয়া আছে

<https://www.youtube.com/watch?v=ewMksAbgd-BI&list=PL1HIh25sbqZnkA1T09UtVHoyjYaMJuK0a>

আর বই পড়তে চাইলে প্রথম অপশন হচ্ছে

https://www.jhankarmahbub.com/files/You_Can_Draw_in_30_Days.pdf

ধাপ-২: তোমাকে কালার বুঝতে হবে। কোন কালারের সাথে কোন কালার যাবে। তুমি কি কটকটে কালার দিবা না অন্য কোন কালার দিবা। কোন আইটেমের জন্য কোন কালার দিলে যাবে, ভালো লাগবে সেটা না বুঝতে হবে। সেজন্য Warm কালার, cool কালার, Neutral কালার, কালার হারমনি, কালার ভুল, কালার কনটেক্ট, কালার কম্বিনেশন সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। কালারের যে মুড আছে, ফিলিংস আছে, বিহেভিয়ার আছে, RGB, CMYK, hue, saturation সেগুলা মাথায় রাখতে হবে। আবার কোন কালার প্রেসে গেলে মাইর খাবে (প্রিন্ট আউট হলে নষ্ট হয়ে যাবে) কিন্তু ওয়েবসাইটে ফুটে উঠবে সেগুলি নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে। অথবা এই ছোট ভিডিওটা দেখে ফেলতে পারো।



ধাপ-৩: সব ডিজাইনেই কিছু না কিছু কথা লেখা থাকে। সেই লেখাগুলোর ফন্ট কি হবে? সাইজ কেমন, কোন ফন্টের সাথে কোন ফন্ট যাবে। সেটা কি পড়া ইজিয়ার হবে। এই পুরা জিনিসটাকে বলে টাইপোগ্রাফি। ভালো ডিজাইনার হতে হলে তোমাকে টাইপগ্রাফি জানতেই হবে। কোন মাফ নাই।

টাইপগ্রাফি নিয়ে এই ছোট ভিডিওতে অনেক কিছু কভার করেছে।

অথবা:

<https://designshack.net/articles/graphics/8-rules-for-creating-effective-typography/>

ধাপ-৪: এর পরে তোমাকে কোন একটা সফটওয়্যার শিখতে হবে। সেটা হতে পারে photoshop বা illustrator দুইটার যেকোন একটা দিয়ে শুরু করতে পারো। এই দুইটার মধ্যে কী পার্থক্য জানতে হবে। সেটার জন্য বাংলায় ইংরেজিতে প্রচুর টিউটোরিয়াল পাওয়া যায়।

এদের মধ্যে একটা হচ্ছে- <https://www.youtube.com/watch?v=QOmV-zeeZGQY&list=PLiy2h676lFD9MPuqoTLFXdr5NUVRPSb6F>

illustrator শিখার অনেকগুলা টিউটোরিয়াল আছে এইখানে

<https://design.tutsplus.com/series/learn-adobe-illustrator--cms-1110>

ধাপ-৫: ওভারঅল জিনিস টা কেমন হবে দেখতে। পুরা জিনিস টা এক সাথে ভালো লাগতেছে কিনা সেই জিনিস টা খেয়াল রাখতে হবে। এটাকে বলে লেআউট কেমন হবে। অর্থাৎ কোন জিনিস টা কোথায় দিলে সেটা আগে চোখে লাগবে, গ্রাফিক ডিজাইনের উদ্দেশ্য ফুলফিল হবে আবার বেখান্না লাগবে না। একটা ডিজাইনে অনেকগুলা পার্ট থাকে সেগুলা একটার সাথে আরেকটা মিল খাচ্ছে কিনা সেটাকে বলে কম্পোজিশন ঠিক আছে কিনা বুঝতে হবে। সেটা বুঝার জন্য এই ছোট ভিডিওটা দেখে ফেলো।

<https://www.youtube.com/watch?v=a5KYIHNKQB8>

ধাপ-৬: গ্রাফিক ডিজাইনের অনেকগুলা এরিয়া আছে। তার মধ্যে যেকোন একটা এরিয়াতে তোমাকে ফোকাস করতে হবে। যেমন, logo ডিজাইন, পোস্টার/ব্যানার ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, মোবাইল এপ ডিজাইন, টি-শার্ট ডিজাইন। আরো অনেক কিছু। যেকোন একটা কিছুর দিয়ে তোমাকে শুরু করতে হবে। নিজে নিজে কয়েকটা বানিয়ে ফেলতে হবে। কেউ কাজ না দিলেও তুমি ফ্রি ফ্রি কিছু মানুষের জন্য কিছু জিনিস বা কিছু কোম্পানির জন্য বানিয়ে ফেলতে পারো। যেমন ২১ এ ফেরহারির জন্য শৃঙ্খা, স্বাধীনতা দিবসের জন্য, অথবা তোমার বন্ধুর ফেইসবুক কভার। হাবিজাবি বানিয়ে তোমার একটা ২০-২৫ টা কাজ এর একটা পোর্টফোলিও বানিয়ে ফেলতে হবে।

ধাপ-৭: তুমি যখন অনেকগুলা গ্রাফিক ডিজাইন করে ফেলবে (সেগুলা ফ্রি না পেইড, তা খুব বেশি মানুষ জিজ্ঞেস করবে না) তখন তোমার টার্গেট হবে গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড কাজ পাওয়া। সেটা দেশে কোন চাকরি হতে পারে, কেউ অনলাইনে কাজ করে তাকে হেল্প করার জন্য হতে পারে অথবা নিজেই বিভিন্ন ফ্রীল্যানচিং সাইটে প্রোফাইল খুলে চেষ্টা করতে পারো।

এইটা হচ্ছে সিরিয়াল অনুসারে ধারাবাহিকভাবে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে গড়ে তোলা। তুমি চাইলে রিভার্স স্টাইলেও চেষ্টা করতে পারো। আগে ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটরের টিউটোরিয়াল দেখলে, আলতু-ফালতু হলেও কিছু জিনিস বানিয়ে ফেললে। তারপর একটু করে কালার থিয়োরী, টাইপোগ্রাফি, ড্রয়িং শিখলে।

মেইন কথা হচ্ছে, ভালো গ্রাফিক ডিজাইনার হতে হলে, ফটোশপের বাইরেও তোমাকে কিছু জিনিস শিখতে হবে সেটা আগে হোক বা পরে হোক।

গ্রেডইয়ার্ড ক্রিনিকেল

মোঃ আকিব রূবাইয়াত তাহমিদ

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ



আজ ১৭ মেপ্টেম্বর, ২০২৯...

তবে তারিখটা সঠিক কিনা তা বলতে পারছি না। কারণ এক গ্রেডইয়ার্ড এর সামনে একটা ছোট গেজেট পেয়েছিলাম বছর খানিক আগে। সেখানে যে তারিখ দেখেছিলাম সেই অনুযায়ী আমি তারিখ গণনা করে যাচ্ছি। তবে নিয়মিত যে হিসাব রাখছি তা না।

অনেকদিন ডাউন স্ট্রিটে যাওয়া হয় না। তাই আজ গেলাম ঐ রাস্তার ১৩ নম্বর বিল্ডিংয়ের সামনে। জায়গাটির সব স্থানে ঘুরে ফিরে দেখলাম। হঠাৎ অনুভব হলো, চোখের ঠিক কোনায় দু'ফোঁটা জল জমতে শুরু করেছে। জায়গাটি আমাকে স্মৃতিকাতর করে। কারণ এটি আমার স্কুল ছিল। প্রতিদিন বাবা হাসপাতালে যাওয়ার পথে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যেত। বলে রাখা ভালো, বাবা ছিলেন ন্যাশনাল হাসপাতালের সার্জন। আমি ও আমার বন্ধু ক্রিস্টিনা, স্টিফেন আর এলিসা নিয়মিত এক গ্রুপে আমাদের ক্লাস সারতাম। ইন্টারঅ্যাক্টিভ বইগুলোতে অ্যালফাবেট A এর ওপর স্পর্শ করতেই আওয়াজ হতো- এ ফর অ্যাপল। আমরাও চিকার করে বলে ওঠতাম।

আমার ঠিক মনে আছে, পঞ্চম জন্মদিনে ম্যাকবুক উপহার পেয়েছিলাম। তখন আমাদের দেশে নতুন ফোরজি সংযোগ এসেছে। সেটা ছিল তখনকার সবচেয়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা। ইউটিউব আর নেটফ্লিক্সে কার্টুন নিয়ে মন্ত্র থাকতাম ছোট আমি।

আমার ঝাপসা মনে আছে, প্রতি রবিবারে গির্জায় যাওয়ার পথে এলিসা আর তার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা হতো আমাদের। আমি আর এলিসা একসাথে প্রার্থনা সংগীত গাইতাম, কনফেশন পর্ব শেষ করে আবার একসাথে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিতাম। আমার মা ছিলেন ধার্মিক প্রোটেস্ট্যান্ট আর এলিসার মা-ও ছিল ধার্মিক, তাই ওনাদের মাঝেও একটা ভালো ভাব ছিল।

আমাদের গলির ঠিক মোড়ে শহরের নামকরা বেকারি ছিল। বাবা বাসায় ফেরার সময় প্রতিদিন কিছু না কিছু ম্যাকস নিয়েই আসতেন।

আমার মনে আছে ২০১৯ এর শেষের দিকের ঘটনা। এশিয়ার দেশ চীনে এক নতুন রোগের আবির্ভাব ঘটে। আমি এ খবরটি জানতে পারি মায়ের মুখে। সেদিন আমি স্টিফেন এর সাথে সাইক্লিংয়ে গিয়েছিলাম। বাবা বললেন, ‘এ রোগ আমাদের দেশে আঘাত হানবে না।’

আমাদের জীবন আগের মতোই সুখে-স্বাচ্ছন্দেই কাটছিল, আমি তখন খুব বেশি বয়সের তা-ও না।

২০২০ এর মার্চে আমাদের দেশে প্রথম আঘাত হানে এই প্রাণঘাতী মহামারী। প্রথম ধাপে অনেক অদক্ষতা আর অব্যবস্থাপনার ফলে ‘২১ সাল অবধি লেগে যায় এর প্রাদুর্ভাব সহনীয় মাত্রায় আনতে; তখন একটানা ছয় মাস বাবা বাসায় আসেননি, হঠাতে ভিডিও কলে কথা হতো। তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোক মারা যায়। এমন অবস্থা হয়েছিল, কবর দেয়ার জায়গা ছিল না; গণকবরের মতো এক লাশের ওপর আরেক লাশ রেখে মাটিচাপা দেয়া হতো।

এই ধাক্কা সামলিয়ে দেশ আবার কিছুটা সচল হলেও ২০২৪ এর শেষে এই রোগ নতুন জিন সিকোয়েল নিয়ে আবার আঘাত হানে। ‘২০ এর মতো এত লকডাউন তখন তত কার্যকর ছিল না, কারণ ইতোমধ্যে দেশের অর্থনীতির অবস্থা নাজুক। তবুও মানুষ সচেতন ছিল, দু’মাস প্রায় স্থবির ছিল সব, তারপর জীবিকার তাগিদে আবার তারা বের হতে শুরু করে। প্রথম কয়েকমাস প্রকটভাবে আঘাত না হানলেও ‘২৪ এর ঠিক শেষের দিকে এই রোগ খুব প্রকট আকার ধারণ করে।

আবার সেই বিশ-একুশ। এই সময়ে এত পরিমাণ ডাক্তার আর স্বাস্থ্যকর্মী মারা যায় যে, তখন আর মহামারীকে রোধ করার মতো জনবল ছিল না আমাদের দেশের।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীও তখন মারা যায় চিকিৎসার অভাবে। বলে রাখা ভালো, মাত্র দু-একজন মন্ত্রী বেঁচে ছিল তখনও।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাই, প্রধানমন্ত্রীও গত হয়েছে মাস দুয়েক আগেই। এর মাঝেই ভ্যাকসিন যে আর আবিষ্কার হবে না, এটা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল মানুষজন।

হঠাতে আমার মায়ের প্রচন্ড জ্বর, এদিকে হাসপাতালে ডাক্তার আর নার্সের সংকট। আর এত এত মানুষের মৃত্যুর সংবাদে এমনিতেই সবাই বিপর্যস্ত ছিল। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেলাম তখন, যখন হাসপাতালে নেয়ার পথেই মা আমাদের ছেড়ে চলে যায়।

মাকে কবর দিয়ে গ্রেভইয়ার্ডের পাশে বসে সেদিন অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। এরপর মনে হয় না এত ক্রন্দন কখনো করেছিলাম।

বাবা নিয়মিত ডিউটি করছিলেন, বাবাও হঠাতে আমাকে ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে চলে যায়। বাবা মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে আমাকে বলে যায়, ঈশ্বরের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করতে আর দেশের সেবা করতে।

এলিসাকে ঠিক শেষ কবে দেখেছিলাম মনে করতে পারছি না। ২০২১ এর শেষে

একবার গিজায় যাওয়ার পথে দেখা হলেও সে আগের মতো প্রাণচক্ষুল আর ছিল না। কখন, কোথায়, কিভাবে মারা গেল সে, সেই খবর আমার আজও অজানা।

এরমধ্যেই শহরের বেশিরভাগ অংশই জনশূন্য হয়ে যায়। আমরা যেদিকটায় থাকি সেই অংশ সম্পূর্ণ নীরব, নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে।

প্রথম কয়েকদিন হাসপাতালে হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছি। এক সময় এক এক জন আমাকে ছেড়ে চলে যেতে থাকে। রাস্তায় রাস্তায় লাশের স্তপ জমতে থাকে। গ্রেভইয়ার্ডগুলোতে আর লাশ করব দেয়ার জায়গা থাকে না।

কয়েকদিন রাস্তার পাশে থাকা জনশূন্য ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে চকলেট খেয়ে দিন আর রাত কাভার করেছি।

শহরের এ গলি ও গলি ঘুরে বেড়িয়েছি, চোখের সামনে কুকুরগুলোকে মানুষের লাশ খেতে দেখেছি।

আস্তে আস্তে শহরের কুকুরগুলোও মারা যেতে লাগলো, চিড়িয়াখানা এলাকায় গিয়ে দেখলাম কোন পশু আর জীবিত নেই।

আমি যে ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসে আছি দুই বছর আগেও এখানে আলো জ্বলত, ঠিক আগের মতো না হলেও আলোকিত থাকতো শহরের এই অংশটি। কিন্তু আজ মাথার ওপর নিষ্ঠুর আকাশ, আশেপাশে কোন আলোর আশা করাও যেন অপরাধ।

এখন রাত কয়টা বাজে ঠিক জানি না, তবে বোধ করি মধ্যরাত তো হবেই; আকাশ আজ খুব পরিষ্কার। শহরের সবাই আমাকে ছেড়ে পাড়ি জমালেও আমি এখনো তাদের কাছে যেতে পারি নি। হঠাৎই চার্লি পুথের সি ইউ এগেইন গানাটি ঠোঁটের কোণে চলে আসলো।

বয়সের বিচার করলে আমি সদ্য দাঢ়ি গজানো এক কিশোর। কিন্তু অভিজ্ঞতার হিসেবে আমি হয়ত পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তির চেয়েও অভিজ্ঞ!

আমারও দিন হয়ত ফুরিয়ে আসছে। আমিও হয়ত খুব তাড়াতাড়ি পাড়ি জমাব ঐ দূর আকাশে। তবে এই আমার পরিবার, মহল্লা, শহর জনশূন্য হওয়ার পিছনে যারা দায়ী, তারা হয়ত ইতিমধ্যে যমরাজের হাতে আচ্ছা ধোলাই খাচ্ছে। তারা এরকম না করলে হয়ত আমার শহর আরও জীবিত থাকত হাজার বছর। মানব সভ্যতা হয়ত মাথা উঁচু করে দাঢ়িয়ে থাকত আমার শহরে!

আবেগ ও অনুভূতি

ইমরাত জাহান জেরিন

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ,
মতিঝিল, ঢাকা



দেহ বা মনের সংবেদন সৃষ্টি হওয়াকে অনুভূতি বলে। আমরা আবেগকে অনুভূতির সমার্থক ধরতে পারি। কেননা, অনুভূতি শারীরিক বা মানসিক দুই'ই হতে পারে কিন্তু আবেগ মূলত মানসিক।

আবেগ এমন একটি মানসিক অবস্থা, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয়, সচেতন উদ্যম থেকে নয়। এর সাথে মাঝে মাঝে শারীরিক পরিবর্তনও প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে আবেগকে বলা যায় অনুভূতির উৎস। আবার শারীরিকভাবে বলতে গেলে, বিভিন্ন উদ্দীপনার কারণে স্নায়ুতন্ত্র এবং বিভিন্ন গ্রন্থির সাহায্যে ঘটা মনোদৈহিক অন্তর্নিহিত পরিবর্তনই হলো আবেগ। আর যদি সামগ্রিকভাবে বলতে চাই, চেতনার যে অংশ অনুভূতি বা সংবেদনশীলতার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, তাকে আবেগ বলা যায়। তবে বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর, কিন্তু আবেগ সব সময় যুক্তির পথে হাঁটে না। আবেগের ভিতর অনুভূতির নানা রঙ ও স্তর থাকে। সব অনুভূতি যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞান আবেগের সঠিক পথ ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ।

আবেগ শুধুমাত্র আমাদের অনুভূতি বা একটি মানসিক অভিজ্ঞতাই নয়, আমরা সকলেই সুখ, ভয়, বিষণ্ণতা, ঘৃণা, বিস্ময়,

ক্রেতে অনুভব করতে পারি, যেগুলোকে ছয়টি মৌলিক অনুভূতি বলা হয়। আর এগুলো জৈবিক ও পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত বিশেষ ঘটনাগুলোর বিশেষ প্রতিক্রিয়া। আমরা আমাদের মস্তিষ্ক দ্বারা আবেগ অনুভব করি। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আমাদের মানসিক অবস্থা, মুখের অভিব্যক্তি, কাজ বা শারীরিক পরিবর্তন আবেগকে প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- কেউ একজন কোন কিছু নিয়ে সুখী থাকতে পারে, আবার কারো উপর মোটামুটি স্থায়ীভাবে রেগে থাকতে পারে, এটি তার আবেগ। কিন্তু অন্য একজনের সাময়িক বা বৈষয়িক আনন্দ, উদ্বেগ বা দুঃখের সাধারণ অনুভূতি থাকতে পারে- এটি তার মেজাজ। মেজাজ জিনিসটি ক্ষণস্থায়ী এবং এটি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু আবেগ জিনিসটি দীর্ঘস্থায়ী এবং এটি সম্পূর্ণ মানসিক। তাই আবেগ পরিবর্তনের জন্য মন দায়ী। কারণ মনের ভেতর কোনো কিছু গেঁথে গেলে তার পরিবর্তন হতে সময় লাগে।

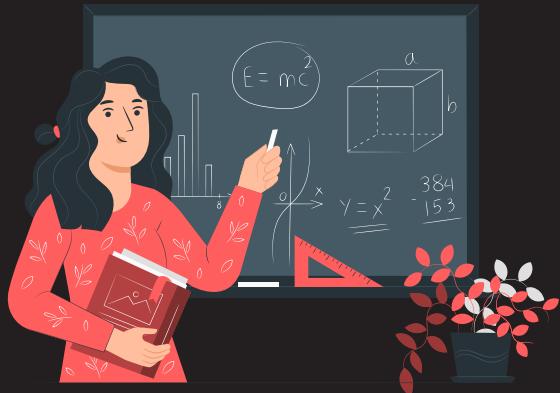
আমরা যখন খুব বেশি মানসিক চাপের মধ্যে থাকি, তখন আমাদের শরীরে অ্যাড্রেনালিন হরমোন নিঃসৃত হয় এবং

এটি জাতি, লিঙ্গ, মানুষের বয়স নির্বিশেষে আমাদের একই অনুভূতির একই অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় ঘটে। এই প্রক্রিয়া আমাদের দেহে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ স্থাপনের পাশাপাশি দেহের বৃদ্ধি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণসহ আমাদের বিভিন্ন আবেগের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। বৈশ্যিক অনুভূতিগুলো পরিমাপ করা বা বর্ণনা করা খুব কঠিন, কারণ ব্যক্তিগতভাবে এক-এক জনের অনুভূতি একেকভাবে আবেগকে প্রকাশ করে।

ধরে নেন, আপনি এবং আপনার বন্ধু একে অপরের উপর প্রেমে পড়েছেন। আপনাদের আবেগের ধরন একই থাকা সত্ত্বেও আপনার আবেগের অভিজ্ঞতার বর্ণনার সাথে আপনার বন্ধুর বর্ণনা সামান্য হলেও ভিন্ন হয়। প্রেম-ভালোবাসা একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। কিন্তু ভালোবাসার অনুভূতি সবার ক্ষেত্রেই একই রকম হয়। কষ্টও একই রকম হয় আবার আনন্দও ঠিক একই রকম হয়ে থাকে। তাহলে কেন অপর পক্ষ ঠিক নিজের মত করে আপনাকে অনুভব করতে পারে না? আনন্দ ও কষ্ট প্রকাশ করতে পারে না? তাহলে বলা যায়, এর মধ্যে ভিন্নতা কিছু না কিছু অবশ্যই আছে। আর সেই ভিন্নতাটা হল দৃষ্টিশক্তির, চেতনার ও বোধের পরিবর্তন। একই বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানে আর ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নতর ভাবে প্রকাশ করা হয়।

অর্থাৎ, আবেগ-অনুভূতির স্বরূপ সৃষ্টিলগ্ন থেকে একই রকম। শুধুমাত্র স্থান, কাল ও পাত্রবিশেষে আবেগের মাত্রা বিভিন্ন রকম হয়।





আমাদের শিক্ষক

শাহরিন তাবাময়ুম নোভা

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং,
বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

প্রথমেই আসসালামু আলাইকুম আপু। নতুন বছর তো এসে গেল, আপনাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। নতুন বছরে সবারই নতুন নতুন কিছু ইচ্ছা থাকে যে, লাইফে এই চেঞ্চটা আনবো। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার এই বছরের প্ল্যানটা কী এবং স্টুডেন্টদের জন্য কি রকম হওয়া উচিত? আর এই ইচ্ছা অনুযায়ী সারা বছর কাজ করার জন্য কি উপায় ফলো করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

নোভা আপুঃ আমার এই বছরে প্ল্যান হচ্ছে নিজের স্কিল আরো উন্নত করা অ্যানিমেশনে, যাতে আরো রিয়েলিস্টিক কন্টেন্ট বানাতে পারি স্টুডেন্টদের জন্য। আপাতত এতটুকুই প্ল্যান। বাকিটা আল্লাহর হাতে।

আমরা সবাই জানি যে, আপনি প্রকৌশল এবং মেডিকেল দুইটায়ই ভালো পজিশনে ছিলেন। দুইটাতেই কেন পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা হলো? আর কেনইবা মেডিকেলকে বেছে না নিয়ে বুয়েটকেই বেছে নিলেন?

নোভা আপুঃ মেডিকেলে পড়ার ইচ্ছা ছিলোনা। তবে বায়োলজি ভালো পারতাম, তাই মেডিকেলে চেষ্টা করে দেখি। ভাগ্যক্রমে চান্স পেয়ে যাই। তবে ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্যই যেহেতু মূল প্রস্তুতিটা নিয়েছিলাম এবং স্বপ্নের জায়গায় চান্স পেয়েছিলাম, তাই বুয়েটকেই বেছে নিয়েছিলাম।



কোনো কোচিং করা ছাড়াই শুধু এইচএসসি লেভেলের বই বাসায় নিজে নিজে পড়লে মেডিকেলে চাঙ পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?

নোভা আপুঃ আমি ও ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোচিং করিনি। নিজের মত করে পড়েছি। চাঙ পাওয়া অসম্ভব নয়।

শুধুমাত্র একজন লেখকের বই পড়েই কি মেডিকেল এবং বুয়েট উভয় পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফল করা যাবে? আর পাঠ্যবই বাদে অন্যান্য বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

নোভা আপুঃ আমার মূল টার্গেট ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং। তাই পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত এই সাবজেক্টগুলো একাধিক লেখকের বই থেকে পড়েছি। আর উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান দুইটা বেসিক বই-ই ফলো করেছি। এটা তোমার লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে



মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দিন এবং ফলাফল প্রকাশের দিনের গল্পটা যদি পাঠকদের সংক্ষেপে জানাতেন।

নোভা আপুঃ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দিনের মজার ঘটনা বলি, আমি সকালে উঠে ইন্টিগ্রেশন এর ম্যাথ করে এক্সাম দিতে গিয়েছিলাম। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রিপারেশন আমি যেকোন অবস্থাতেই ঠিক রাখতাম। খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষা দিই, উত্তাসে MCQ যেভাবে দাগাতাম ওভাবেই একটু মাথা খাটিয়ে বা মনে করে করে দাগাতে থাকি। এভাবে ৯৫টার মতো দাগালাম। নেগেটিভ মার্কিং নিয়ে টেনশান করতাম না, কারণ চাঙ না পেলেও সমস্যা নেই। তো যেদিন রেজাল্ট দিলো, সেদিন উত্তাস থেকে কোচিং করে বাসায় ফিরে সুসংবাদটা জানলাম। ঐ মুহূর্তের অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ্য নয়। আবু-আম্বুর জন্য আরো বেশি খুশি লাগছিল, তারা আমাকে নিয়ে কতটা গর্বিত তা দেখে। ❤️

বায়োলজি বইয়ে তথ্য তো অনেক। তাহলে কিভাবে বুঝবো কোনটা পড়ে মনে রাখা প্রয়োজন আর কোনটা একবার পড়লে পরবর্তীতে পড়ার প্রয়োজন নেই? আপনি কিভাবে বায়োলজি পড়তেন? আর কিভাবে পড়লে বায়োলজি মজার এবং সহজ মনে হবে?

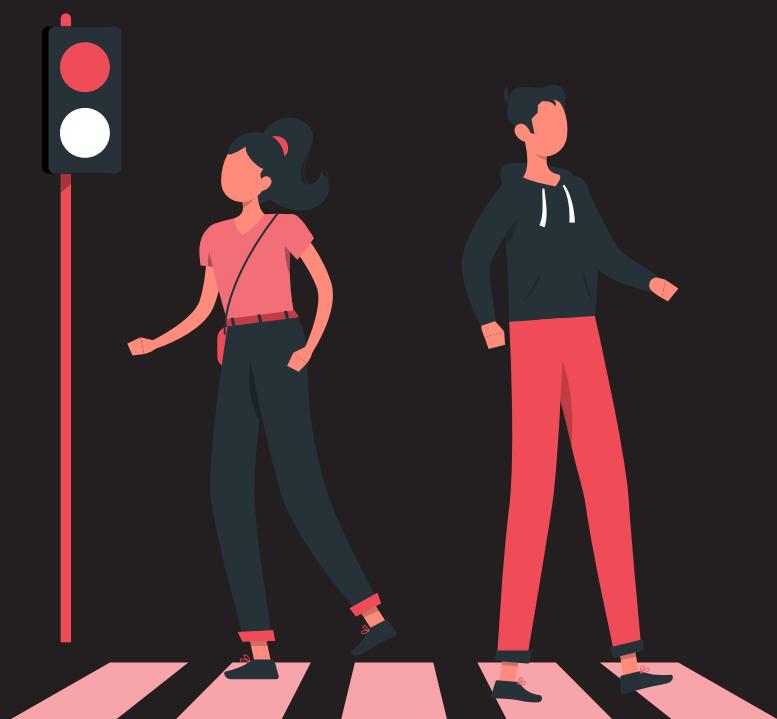
নোভা আপুঃ আমি লিখে লিখে পড়তাম। বারবার রিভাইস দিতাম। আর ডায়াগ্রাম করে পড়তাম।

মেডিকেলের এডমিশন পরীক্ষা দেবার আগের দিন রাতের প্রস্তুতি নিয়ে যদি আমাদের একটু জানাতেন।

নোভা আপুঃ আমি যদি আমারটা বলি, আমি আগের রাতে কোনো প্রস্তুতি নেইনি। তবে উক্তাসের ইংরেজি বইটা একটু দেখে গেছিলাম।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একজন শিক্ষার্থী কিভাবে বুঝবে যে, সে সঠিক পথে হাঁটছে কিনা?

নোভা আপুঃ আমি বলব যে, এটা সবার জন্য আলাদা হতে পারে। তবে আমার মতে, একজন স্টুডেন্ট এর যখন নিজের উপর ওভার-কনফিডেন্স কাজ করবে, তখন বোবা যাবে সে ট্র্যাকে নেই। যখন তার মধ্যে সবসময় পরিশ্রম করার প্রবণতা কাজ করবে, একাধিক বার পারার পরেও আরো পারার ভয় থাকবে, সেটাকেই মূলত ট্র্যাকে থাকা বলে। কারণ সে জানে যে, তার জন্য সামনে কি আছে এবং তার জন্য সে সোচ্চার।



ভর্তি পরীক্ষা তুলনামূলক সহজ কোনটার? মেডিকেল/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ ভার্সিটি ক ইউনিট?

নোভা আপুঃ সত্যি কথা বলতে গেলে কঠিন সবগুলোই। যেহেতু এটা সারা বাংলাদেশের জন্য পরীক্ষা, তাই সেখানে একটা নার্ভাসনেস থাকে। তবে তার মধ্যে যদি তুলনা করতে বলো, তাহলে আমার কাছে বুয়েটের পরীক্ষাটি একটু বেশি কঠিন লেগেছে মেডিকেলের চেয়ে। অর্থাৎ, যেই জিনিসটাকে মন থেকে সবসময় চেয়েছি

"মেডিকেলে পড়লে সারাক্ষণ পড়া লাগে"- এটা কি লোকমুখে প্রচলিত নিছক ভ্রান্ত ধারণা নাকি ভয়ংকর সত্য?

নোভা আপুঃ সত্যি বলতে পড়াশোনা সব সেটারেই করতে হবে। সেটা মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং- যেটাই হোক না কেন। তবে আমারও ছোটবেলায় এই ভীতিটা ছিল। তাই আর মেডিকেলকে প্রথম চয়েজেই রাখিনি। কিন্তু এখন বুয়েটে এসে বোঝা যাচ্ছে যে, না, এখানেও অনেক পড়তে হয় আসলে।



আপু, আপনি কি একদম HSC জীবনের শুরু থেকেই মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন?

নোভা আপুঃ সত্যি কথা বলতে, তোমরা মাশাআল্লাহ যেভাবে পড়াশোনা করছ এখন থেকেই, আমি আসলে প্রথম বর্ষে কিভাবে যে সময় কাটিয়েছি, নিজেও বলতে পারবো না। পরে আমি দ্বিতীয় বর্ষে খুব ডিপ্রেসড হয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য টেষ্ট পরীক্ষার আগেও শিওর ছিলাম না যে, আমি HSC পরীক্ষা দিবো কিনা। কিন্তু মাশাআল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে পার পেয়ে গেছি। তবে তোমাদের জন্য বলব তোমাদের এখনি এতো ভাবতে হবে না। HSC-টা ভালোভাবে দাও, এডমিশন এমনিই ভালো হবে।

আপনার সাফল্যের পিছনের মূলমন্ত্র কি?

নোভা আপুঃ এডমিশনের সময় আমার সাফল্যের মূলমন্ত্র বলতে ছিল আমার মাইন্ডসেট। আমার মাথায় এটা ছিল যে, আমার পড়াশোনা নিশ্চিতে চালিয়ে যাওয়ার জন্য যেভাবেই হোক আমার পাবলিক ভাসিটিতে চাঙ পেতে হবে। যাতে আমার বাবা-মা এর উপর প্রেশার না পড়ে। এই চিন্তা-ভাবনাটা আমাকে খুব এনার্জি দিয়েছে, বুস্ট আপ করেছে।



ভালো কোথাও চাঙ পাওয়ার জন্য কি সত্যিই ঘূম বাদ দিয়ে সারা দিন-রাত পড়তে হয়?

নোভা আপুঃ না। ঘূম বাদ দিতে হবে কেন? এটা অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে। অতিরিক্ত পড়ার দরকার নেই। মন দিয়ে দুই ঘণ্টাও বেনিফিশিয়াল হয়। কিন্তু সারাদিন পড়ে রেস্ট ছাড়া পড়াশোনা করলে সেই পড়া মাথায় আসবেই না কোনভাবে। তাই বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে পড়াই ভালো।

মনে করেন, এই করোনাকালে আপনি HSC পরীক্ষার্থী। কোনো কারণে বই শেষ করতে পারেননি। কিন্তু, স্বপ্ন মেডিকেল, যেভাবেই হোক পূরণ করতে হবে। হাতে কয়েক মাস সময় আছে এবং প্রচুর পড়া বাকি। এখন এই অবস্থায় কিভাবে পড়াশোনা করতেন? এতোটুকু টাইমে আপনার পড়ার রুটিনটা কেমন হতো?

নোভা আপুঃ সত্যি বলতে আমি আমার সময়ে করোনা ছাড়াই এতো বড় একটা গ্যাপ করে ফেলেছিলাম। পরে লাস্ট তিন মাসে অনেক হার্ডওয়ার্ক করেছি। সত্যি বলতে দিনে ১৬-১৭ ঘণ্টাও গিয়েছে। যেহেতু আমার পড়ার গ্যাপ আছে, সেটা ফিলাপ এর জন্য তো আসলে পড়া দরকার, তাই পড়েছি। তাই যাদের অবস্থা এখন থেকে খারাপ তারা আর সময় নষ্ট না করে প্লিজ আজকে থেকেই পড়াটা স্টার্ট করো। তোমার সাফল্য আসবেই।

সর্বশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু যদি বলতেন।

নোভা আপুঃ প্রথমত, আমরা একটা খুব সংকটকালীন মুহূর্তে আছি। তো এখন যেহেতু সবাই স্বাস্থ্যবুঝিতে আছে সেজন্য তোমরা সবার আগে নিজে সচেতন থাকবে অবশ্যই এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছেন, তাদের সাহায্য করব। এটা কিন্তু তোমাদের পড়াশোনার পাশাপাশি নেতৃত্ব দায়িত্ব। সেই সাথে যেহেতু পড়াশোনার জন্য অনেক সময় পাচ্ছা এবং স্কুল-কলেজ একইসাথে বন্ধ, তাই এই সময় রুটিন-ওয়াইজ নিজের পড়াশোনাটা নিয়ে যেতে পারো অন্য উচ্চতায়। আর পড়াশোনার জন্য তো অনেক ম্যাটেরিয়াল আছেই অনলাইনে, সেটা কাজে লাগাতে পারো। চেষ্টা করবে তোমার এক সেকেন্ডও যেন বৃথা না যায়। সেই সাথে ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাবে। আর অবশ্যই নিজ ধর্ম অনুসারে প্রার্থনা করবে, যা এই পরিস্থিতিতে তোমাকে অনেক প্রশান্তি এনে দিবে। আর আমার জন্য তোমরা দোয়া করিও। আর তোমাদের জন্য শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিছি।





মেডিকেলের নেপথ্য

মাকান বিনতে ইমরান

Sir Salimullah Medical College

নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক রঙিন স্বপ্ন বুনে সবাই। এই স্বপ্নগুলো ডানা মেলার প্রয়াস পায় এইচএসসি পরীক্ষার পর পরই। সবাই নিজের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য যুদ্ধে নেমে পড়ে। এই যুদ্ধে যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি আলোড়নময়, তা হলো মেডিকেল এডমিশন টেস্ট! কারণও আছে অনেক।

'মেডিকেল' এই শব্দটি আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে, অর্থাৎ সকল মানুষের কাছে সমীহপূর্ণ, আকর্ষণীয় এবং বহুমাত্রিক একটি পেশা। মানুষের জীবন মৃত্যুর মাঝে সৃষ্টিকর্তার পর যার উপরে মানুষ নিজের সম্পূর্ণ আস্থা রাখে, তিনি আর কেউ নন একজন মেডিকেল প্রাকটিশনার (ডাক্তার)।

এখন যদি বলি মেডিকেল এডমিশন পরীক্ষা নিয়ে, তাহলে ইতোমধ্যেই হয়তো অনেকেই জানো, মেডিকেল এডমিশনের জন্য যে সাবজেক্টগুলো গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে, Biology, Chemistry, Physics, English এবং GK। এই বিষয়গুলোর উপরে একটা Clear Concept থাকা আবশ্যিক। মূলত মেডিকেলের প্রিপারেশন নেয়া সবচেয়ে সহজ কারণ এখানে প্রশ্নগুলো হয় বইভিত্তিক। যদি কেউ বইগুলোকে ভালভাবে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে, তার জন্য মেডিকেল কলেজগুলোতে সুযোগ পাওয়া সহজ হয়ে যায়। তবে মেডিকেল এডমিশনের জন্য একটা কথা মাথায় রাখা আবশ্যিক, তা হলো এখানে একজন যত ইফেক্টিভলি তার সময় ইনভেস্ট করবে তার প্রিপারেশনের জন্য; ততই তার প্রিপারেশন উৎকৃষ্ট ও সঠিক হবে। সারাদিন কষ্ট করে পড়লাম কিন্তু দিনশেষে কিছুই মনে থাকলো না, এভাবে না পড়ে একটু গুচ্ছিয়ে পড়লেই সব ইনফরমেশন সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব। শুধু দরকার Dediication এবং Passion এর।



মেডিকেল কলেজ বৃত্তান্তঃ

বাংলাদেশ সর্বমোট ১১২টি মেডিকেল কলেজ আছে, যার মধ্যে ৩৬টি সরকারি, ৭০টি প্রাইভেট এবং বাকিগুলো বিশেষায়িত। এদের মধ্যে ৯টি সরকারি এবং ২৬টি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিট আছে। দেশের চারটি প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই সকল সরকারি ও প্রাইভেট মেডিকেলের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেগুলো হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাস্ট।

তত্ত্বাবধান:

মেডিকেল এডমিশন পরীক্ষা হয় খুবই প্রতিযোগিতামূলক। যেহেতু সবার আগে মেডিকেল পরীক্ষা হয়, তাই কমবেশি সবাই এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, যাদের ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা আছে, তারা ছাড়াও অন্যরা নিজেদের প্রস্তুতি মূল্যায়ন করার জন্য হলেও এডমিশন যুদ্ধের প্রথম পরীক্ষাটিতে অংশগ্রহণ করে। যতই এই পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন হোক না কেন, যারা মূলত পরিশ্রমী, লক্ষ্যভেদ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যারা তাদের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিক এবং প্রকৃত ব্যবহার করতে শিখে এবং পরীক্ষার হলে তার যথার্থ প্রয়োগ করে তাদের গায়ে ‘মেডিকেল স্টুডেন্ট’ এই ট্যাগ লাগে। এটি মূলত আয়ত্ত করা সম্ভব কঠোর অধ্যয়ন ও ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ও দুর্নীতিঃ

শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের মানুষের এই পেশার প্রতি শুন্দা, সমীহ এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়; মেধাবী-মেধাহীন সকলের মধ্যে। প্রয়োজনে অযোগ্যরা দুর্নীতির আশ্রয় নেয় এই পেশায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তারা কখনোই সফল হয় না। সফল হয় শুধু তারাই যারা অধ্যবসায়ী এবং যাদের এই পেশার প্রতি ভালোবাসা আছে।

মেধাবী ও মৃষ্টিশীল মানুষের মঙ্গলাভঃ

এই মেডিকেল কলেজগুলোতে মূলত বাচাইকৃত শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরাই পড়তে আসে। যে কারণে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। চিন্তাশক্তির স্ফুরণ ঘটে এবং নানা আঙিকে তারা নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

মেডিকেল কলেজে পড়ার পদ্ধতিঃ

মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা হয় গ্রন্থে বা বলা যায় গ্রন্থ পদ্ধতিতে। একজন অন্যজনকে ডেমো দেয়, এভাবেই সবার পড়া হয়ে যায়। এই জন্যই মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একধরনের হৃদয়তা তৈরী হয়, যা অন্য শিক্ষা প্রাঙ্গনে বিরল। এবং এর প্রভাব সমাজেও দেখা যায়। এই শিক্ষা এবং এই পেশা গুরুমুখী শিক্ষা অর্থাৎ গুরুকে অনুসরণ করার মধ্যেই একজন শিক্ষার্থীর সফলতা নিহিত। যেহেতু এই শিক্ষার জন্য নানাবিধ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া গড়ে উঠে, তাই এর মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী বন্ধুবৎসল, সৌহার্দপূর্ণ এবং মানবিক মানুষ হয়ে উঠে।

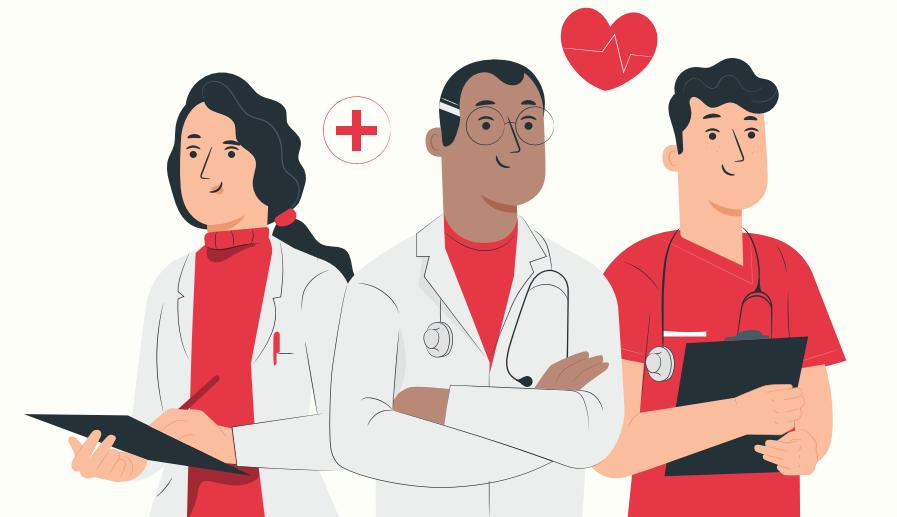
মেডিকেল কলেজ ও বিনোদনঃ

সকল মেডিকেল কলেজেই এক সপ্তাহ বরাদ্দ করা হয় সাহিত্য ও খেলাধুলা নিয়ে প্রতিযোগিতার জন্য। এখানে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভার নির্দারণ বহিঃপ্রকাশ করে থাকে। শুধু তাই না, প্রতিদিনই পড়ার মাঝে বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড়া, হাসি-তামাশা, এইসব যেন মেডিকেল কলেজে সবসময় বহমান।



পেশার প্রতি ভালোবাসাঃ

একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী কিন্তু জীবনে চার বার ডাক্তার হয়। প্রতিটি প্রফের পরেই যেন সে নতুন রূপে ডাক্তার হয়। প্রথম প্রফের পর ২৫%, দ্বিতীয় প্রফের পর ৫০%, তৃতীয় প্রফের পর ৭৫% এবং শেষে ইন্টার্নশিপের সময় সম্পূর্ণরূপে ডাক্তার হয়, যে কিনা মানুষের সেবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে। এই সম্পূর্ণ যাত্রায় একজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর কাছে তার আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যাশা থাকে যে, সে যেকোনো সমস্যায় তাদের সঠিক পস্থা বাতলে দিতে পারবে। সবকিছুতে তার পরামর্শ নেয় এবং গর্ব অনুভব করে। দিনশেষে এই অনুভূতিগুলো একজন মেডিকেল শিক্ষার্থীকে আরো দায়িত্ববান হতে বাধ্য করে।



চিকিৎসা পেশা ও উপর্যুক্তি:

মেডিকেল কলেজের অধ্যয়নের পাশাপাশি যারা নিয়ম করে মেডিকেল জার্নাল, রিসার্চ পেপারগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখে, তাদের জ্ঞান হয় অন্যদের থেকে বেশি উন্নত। কিন্তু শুধু অধ্যয়ন দিয়েই সম্পূর্ণরূপে ডাক্তার হওয়া যায় না, এর সাথে লাগে প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ (দেশে ও বিদেশে) এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী হয়ে উঠে সমৃদ্ধশালী ডাক্তার। তবে যে শিক্ষার্থী তার প্রশিক্ষণকালে যত অভিজ্ঞ ডাক্তারের সংস্পর্শে আসে, তার দক্ষতার মান হয় তত ভালো ও উন্নত।

মেডিকেলের উচ্চতর শিক্ষা ও স্কলারশিপ:

MBBS বা BDS ডিগ্রি নেয়ার পর একজন মেডিকেল ছাত্র বা ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষার জন্য দেশে বা বিদেশে উভয় জায়গায় নিযুক্ত হতে পারে। উচ্চতর ডিগ্রিগুলোর মধ্যে আছে MD, MS, FCPS, FRCS, MRCP ইত্যাদি। তবে দেশের বাইরে যেতে হলে তাকে PLAB বা USMLE এইসব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তারপর যেতে হয়। এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ, যেমনঃ- Commonwealth স্কলারশিপের কথা তো আমরা কমবেশি সবাই জেনে থাকি।

চিকিৎসকের নানামুখী ক্যারিয়ার:

একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী সফলভাবে জ্ঞান অর্জনের পর তার ক্যারিয়ারকে বিভিন্ন রূপে ধারণ করতে পারে, কেউ বেছে নেয় Clinical sector, কেউ বেছে নেয় Research sector, কেউবা Academic sector এ নিজের জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটায়। তবে এই পেশার মধ্যেই আছে এমন বহুমাত্রিক প্রবেশাধিকার (Multidimensional accessibility)।

মেডিকেল স্টুডেন্ট হওয়ার আকর্ষণীয়তা:

'মেডিকেল স্টুডেন্ট' এই ট্যাগ যতদিন একজন শিক্ষার্থীর সাথে থাকে, ততদিন তার কাছে থাকে অগণিত টিউশনি। এবং শুধু তাই না সমাজে সে ব্রিলিয়ান্ট শিক্ষার্থী হিসেবে নাম অর্জন করে ফেলে। মেডিকেল শিক্ষার্থীদের একটা সুন্দর দিক হলো, তারা যেমন সকলের কাছে সমাদৃত হয় তাদের জ্ঞানের জন্য, তেমনি দোয়াও পায় তাদের যাত্রাকালে মানুষের সেবার জন্য। পরিশেষে, যখন তারা ডাক্তার রূপে মানুষকে সেবা প্রদান করে, তখনই তারা অর্জন করে নেয় মানুষের মনের আস্থা এবং পরম সৃষ্টিকর্তার পর মানুষেরা ডাক্তারদের উপরেই নিজেদের সম্পূর্ণটুকু দিয়ে বিশ্বাস করে। এবং এই আস্থা জয়ের পিছনে রয়েছে মেডিকেল শিক্ষার্থীর একান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ। তাই এই পেশা এত প্রার্থিত ও অভিলাষিত।

যদি এই মহৎ পেশায় অন্তর্ভুক্ত হতে চাও তাহলে আর দেরি না করে এখন থেকে সিরিয়াসলি পড়াশোনা শুরু করে দাও এবং পড়াশোনার প্রতি অবহেলা একদম বন্ধ করে দাও। কারণ মানুষ পারে না এমন কিছুই নেই। শুধু দরকার যা চাও তার প্রতি একনিষ্ঠ Dedication এবং Passion এর।



আরডুইনোর পা গুলি

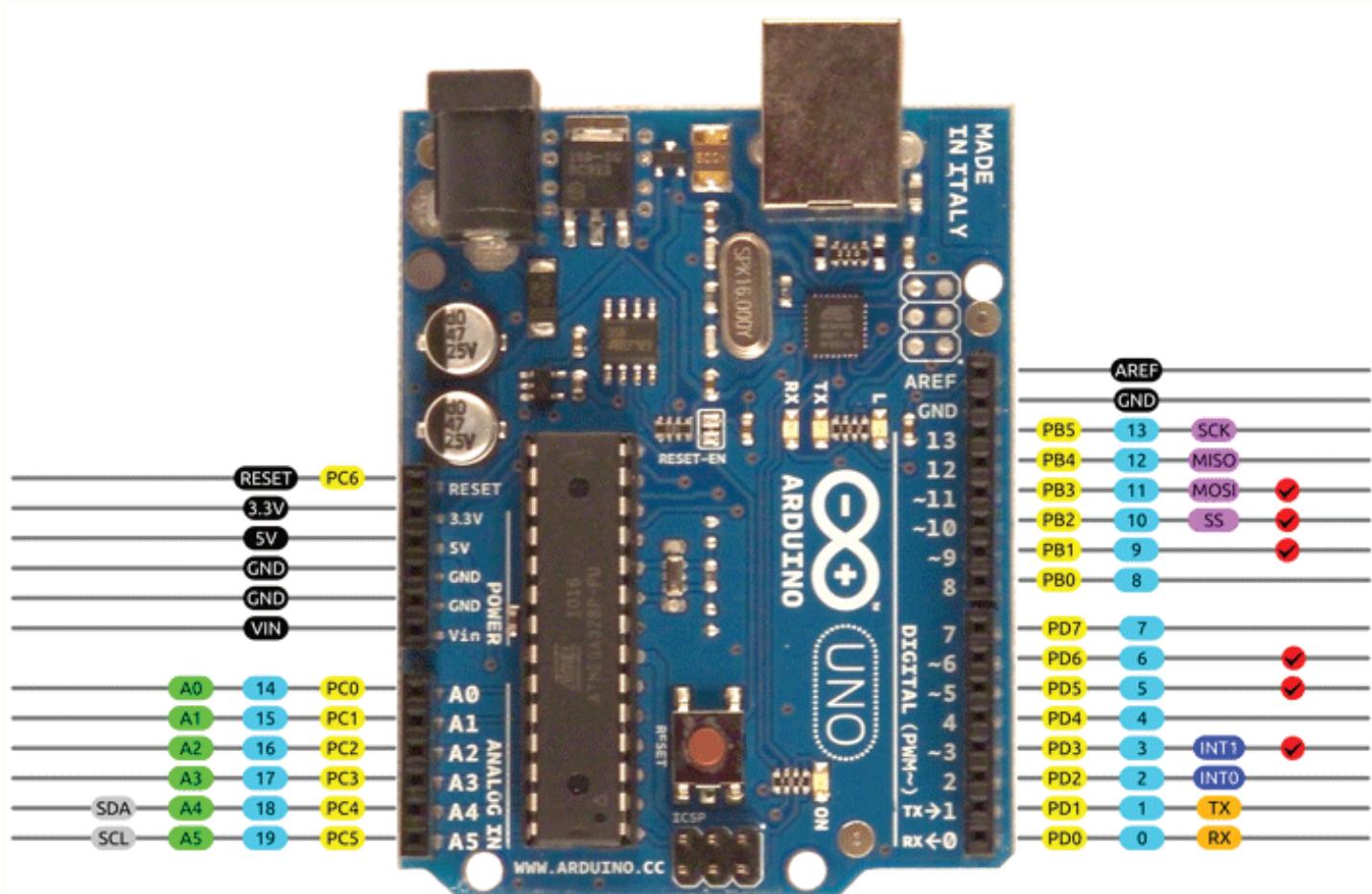
তানভীর শেখ

সিইও, আরডুইনো স্কুল।

আরডুইনো উনোতে 32টি পিন আছে। আজকে আমরা জানবো এই 32টি পিন কিভাবে কাজ করে।

চিত্রে লক্ষ করলে আমরা একটি USB port দেখতে পাব। USB port এর মাধ্যমে আমরা খুব সহজে আরডুইনোতে প্রোগ্রাম আপলোড করতে পারি।

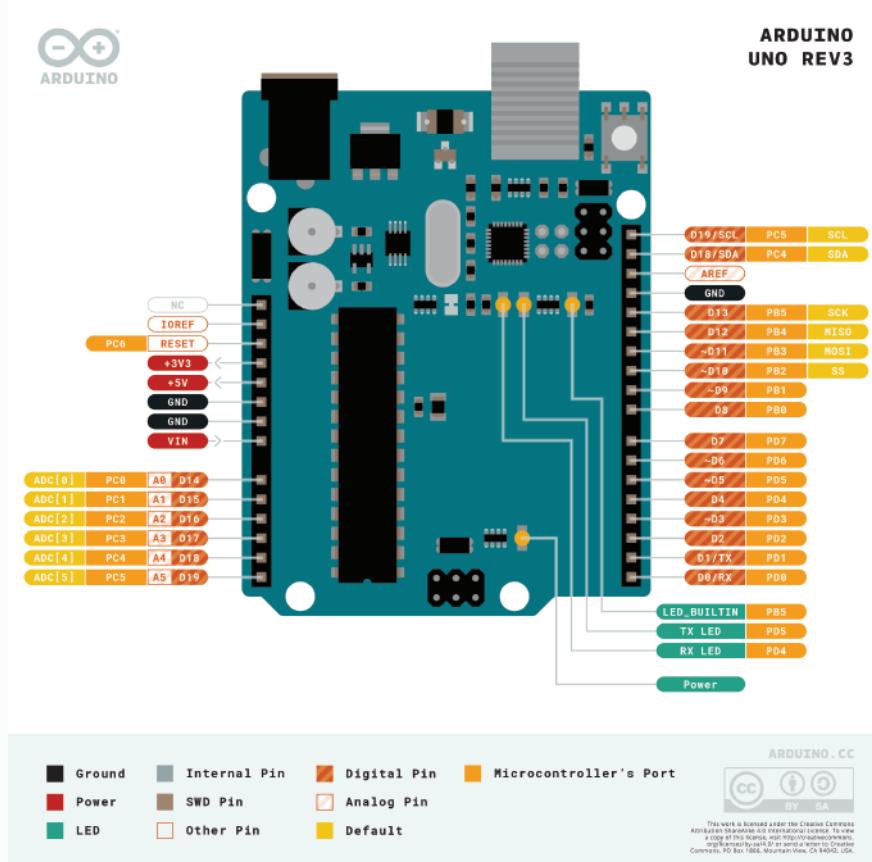
পোর্টের ঠিক পাশে একটি কালো জ্যাক আছে। একে বলা হয় ডিসি জ্যাক। আরডুইনো উনোতে 7 থেকে 12 ইনপুট ভোল্টেজ দেওয়া আছে। আমরা এ পোর্টের মাধ্যমে আরডুইনো উনোতে ইনপুট ভোল্টেজ দিতে পারি।



ডান পাশে একটি সুইচ আছে। আরডুইনো উনোকে যদি কখনো রিসেট করতে হয় তবে আমরা এই সুইচ এর মাধ্যমে রিসেট করতে পারি।

0 থেকে 13, এই 14 টি পিন হচ্ছে ডিজিটাল পিন। ডিজিটাল বলতে আমরা কি বুঝি? হয় জিরো নয়তো ওয়ান। ডিজিটাল পিন হয় 0 আউটপুট দিবে, না হয় ওয়ান আউটপুট দিবে। আমাদেরকে যদি ডিজিটাল পিন 1 আউটপুট দেয়, তাহলে সেখান থেকে ফাইভ ভোল্ট আউটপুট বের হবে। কারণ আরডুইনো উনো ফাইভ ভোল্টেজে অপারেট হয়। আরডুইনো উনোর ডিজিটাল পিনগুলো আউটপুট অথবা ইনপুট দু'টো হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরডুইনো উন্নোর 0 এবং 1 নম্বর ডিজিটাল পিন যথাক্রমে Rx এবং Tx পিন। এই দুইটা পিনের মাধ্যমেই আমরা আরডুইনোতে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারি।



আরডুইনো উনোর ডিজিটাল পিনগুলোর মধ্যে দুইটি পিন আছে, যাদের বলা হয় ইন্টারাপ্ট পিন। ইন্টারাপ্ট বলতে আমরা ব্যাঘাত ঘটা বুঝে থাকি। আরডুইনো উনো চলমান অবস্থায় আমরা যদি এর কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই অথবা ইন্টারাপ্ট করতে চাই, তাহলে আমাদের ডিজিটাল পিন 2 এবং 3 ইউজ করতে হবে।

ডিজিটাল পিনগুলোর মধ্যে ৬টি (3,5,6, 9,10,11) পিন রয়েছে PWM পিন। PWM অর্থ Pulse Width Modulation। যদিও এই পিনগুলো ডিজিটাল পিন, তবে এটি অনেকটা এনালগ এর মত জিরো থেকে 5 ভোল্ট পর্যন্ত আউটপুট দিতে পারে।

আরডুইনো উনোতে আরো চারটি পিন রয়েছে, যেগুলো SPI কমিউনিকেশন এর জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো 10, 13, 12 এবং 13...

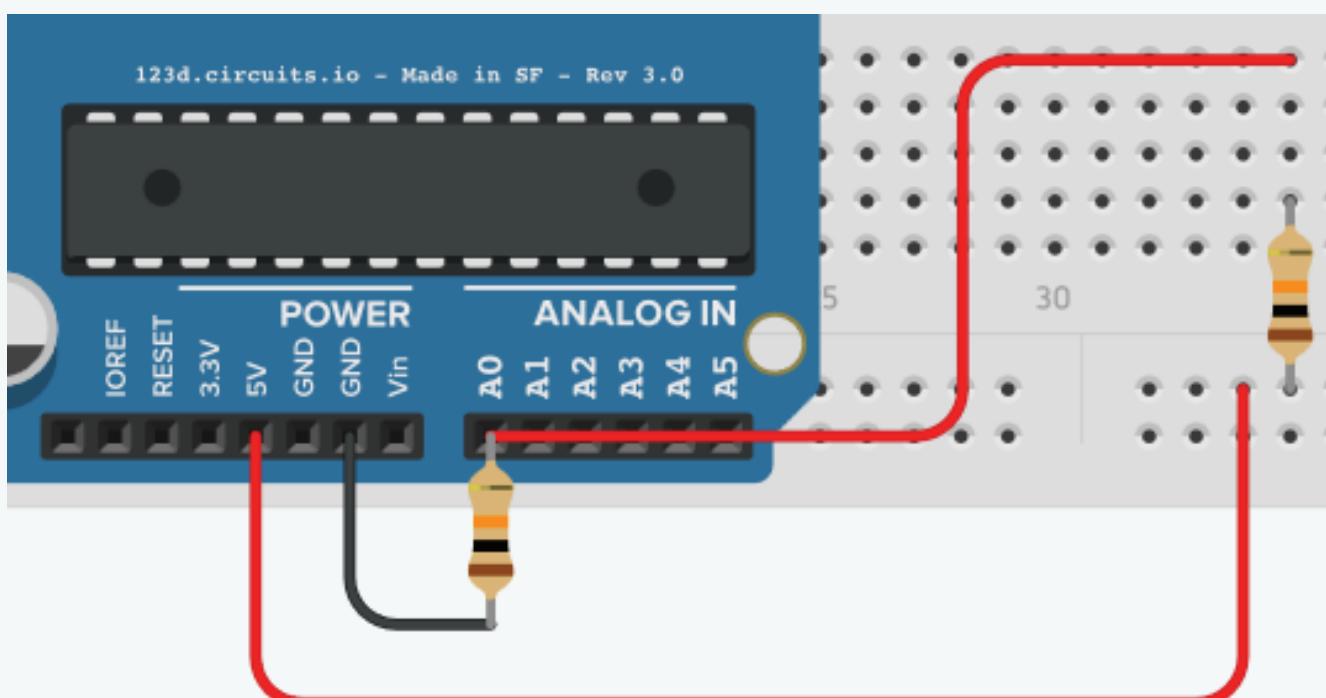
10 হলো Slave select

11 হলো Mosi

12 হলো Miso

13 হলো Sck... আবার 13 নম্বর পিনের সাথে একটি LED কানেক্টেড করা থাকে।

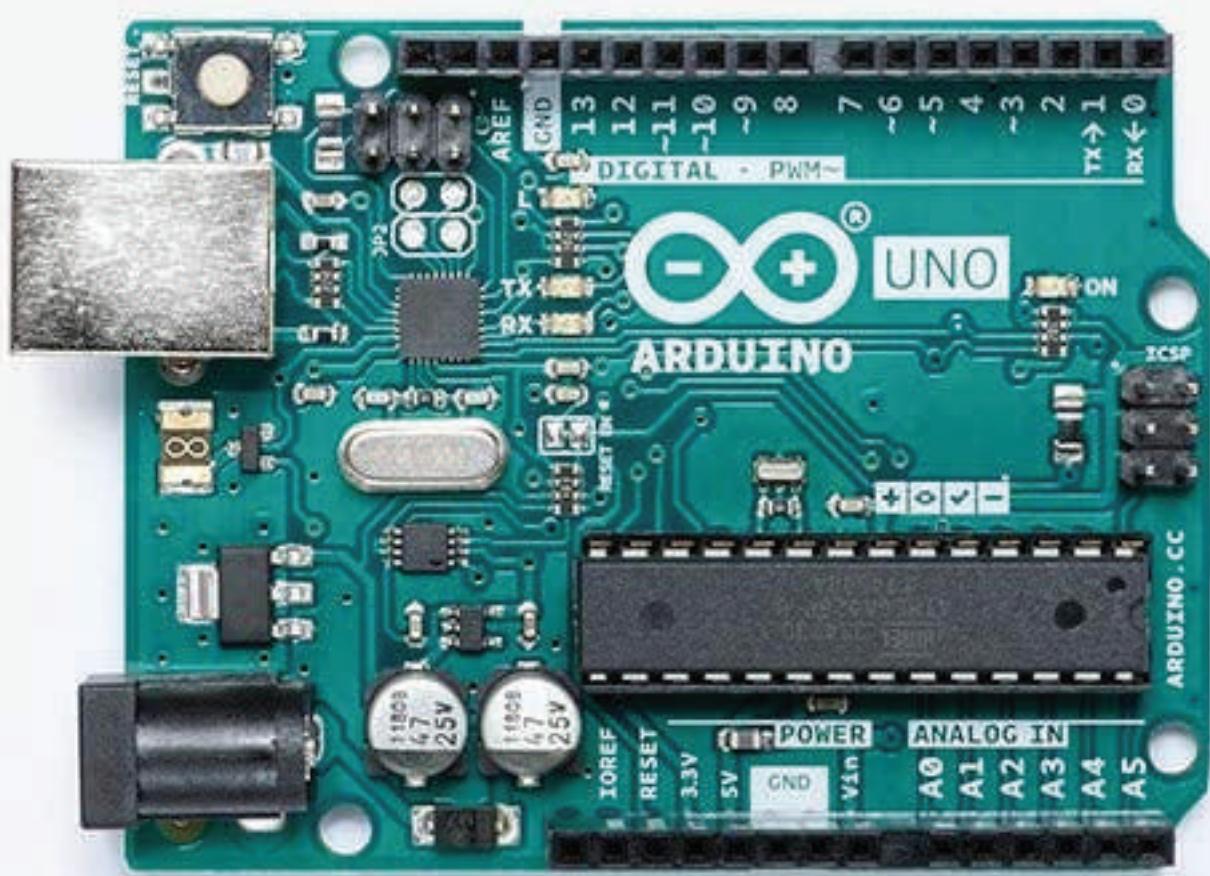
এই চারটি পিন সম্পর্কে পরবর্তী ক্লাসে বিস্তারিত জানবো।



এবার আসি এনালগ পিন নিয়ে। আরডুইনো উনোতে মোট 6টি এনালগ পিন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে A0 থেকে A5।

A2 এবং A5, I2C কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। I2C কমিউনিকেশন আমরা অন্য দিন একটি ক্লাসে শিখবো।

আরডুইনো উনোতে মোট তিনটি গ্রাউন্ড পিন রয়েছে। গ্রাউন্ড পিনের পাশে হাই ভোল্টেজ এর একটি পিন রয়েছে। বাজারে যেসব সেঙ্গর পাওয়া যায়, তার বেশিরভাগই 5 ভোল্টেজ এ অপারেট হয়, এজন্য আমরা আরডুইনো উনো এর 5 ভোল্টেজ পিন ব্যবহার করতে পারি। ফাইভ ভোল্টেজ এর পাশেই রয়েছে 3.3 ভোল্ট এর পিন। অনেক সেঙ্গর বা মোটর রয়েছে যেগুলো 3.3 ভোল্টেজে অপারেট হয়। এই ছিল Pins of Arduino নিয়ে আলোচনা।



কোষকিশোর

জারীর মুহাম্মদ জুবায়ের

তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা

ও এসিপিতে একুশ ব্যাচ থেকে। ভাইয়া ওরই প্রতিবেশী, আবার ওর টিমের মেন্টরও। কাকতালীয়ভাবে না কিন্তু, ভাইয়াই ওকে এনেছেন। ব্যস্ততার ফাঁকে মাঝে মাঝে ওরা ‘পড়ালোচনা’ করে, ঠিক পড়ানোও নয়, গ্রুপ স্টাডিও নয়, মাঝামাঝি।

- আজকে পড়ালোচনা করব না। একুশ শতকে একুশ সালের প্রথম দিন, এমনি কথা বলতে চলে এলাম। তবে আসা অবধি সেরেব্রাম যেভাবে খিচুড়ি সেঙ্গ করছে.....

- আরে তুমি নাস্তা না করে যেতেই পারবে না, মা শীতের সকালে খিচুড়ি চড়িয়েছে। সমন্বয় চ্যাপ্টার পড়ে পড়ে এখন তুমি চারপাশে হরমোন আর থ্যালামাস-ককলিয়া দেখছ, যাহোক- তবে এমনি গল্প করতে এলে? আজ পরীক্ষা ছিল আরকি।

- জানি। তবু কাল পড়তে বসে হঠাত একটা ব্যাপার মনে হলো, তোকে বলতে এলাম। নতুন বছর আমাদের চিন্তার মধ্যে মারাত্মক একটা আলোড়ন ফেলে। স্কুলে বছরের সাথে ক্রমাগত ক্লাস চেইঞ্জ হতো বলে নতুন বছর মানেই কেমন একটা সবকিছু নতুন করে শুরু করার আবহ মনে হয়। ডিসিশান, প্ল্যানিংয়ে নতুনত্বের একটা স্বাগ পাওয়া যায়। এই যে গতকাল, আজকে সিস্টেমে হালকা একটা অ্যান্ড্রোনালিন রাশ হচ্ছে, টের পাছিস সেটা?

- ঠিক কিরকম? লাইক গতরাতে যে আমি রুটিন বানাবো বলে একটা পেইজ নিয়ে বসেছিলাম?

- তুই তবু বসেছিস, আমি নিউজ ফিডে ছিলাম, সারা সপ্তাহুড়ে সেভাবে যাইনি, হ্যাপি নিউ ইয়ারের আঁতলামি মেসেজ দেখতে গিয়ে এই অবস্থা; তবু মাথার মধ্যে ‘কাল থেকে গুছিয়ে শুরু করব’-টাইপ একটা উদ্দীপনা টের পাচ্ছিলাম।

- যাক, তুমি ভিডিওর পাশাপাশি বই ভালোই পড়ছো, কথায় বইয়ের ভাষা পাচ্ছি। তো?

- তুই কি বুঝতে পারছিস, এই আগ্রহের হরমোনাল পটেনশিয়ালকে কাজে লাগিয়ে বছরের এই পিক টাইমে কিছু ভালো অভ্যাস গ্রো করা যায়?

- অভ্যাস বলে কী বোঝাচ্ছ? লাইক যারা ব্রাশ করতে করতে পড়া শুরু করে ব্রাশ করতে করতে শেষ করে, তারা কী গ্রো করবে? পঁচিশ ঘন্টার দিনের জন্য একটা মহাকর্ষীয় ধ্রুবক?
- বলছি, আগে তুই নিজেকে একটা কোষ ভাব। নাদুস-নুদুস, মাত্র বিভাজিত হওয়া একটা অপত্য কোষ।

মুখে একটা ‘আবার শুরু হইসে’ ভাব এনে ও বলল,

- আজকে না পড়া হবে না? ওকে, ভাবলাম।

- ওকে, টাটকা ভাজক কোষ ধরে নে, সামনে তার বিশাল একটা সময় আবার বিভাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত, গরম গরম বিপাকীয় চারপাশ, অবস্থাটাকে আমরা কী বলছি?

- ইন্টারফেজ, রাইট?
- রাইট। প্রথম ধাপ?
- লাইক উপপর্যায়? জি ওয়ান ফেজ আরকি।



- এখন এখানে দ্যাখ, কী হবে তোর মাঝে। তুই পরবর্তীতে বিভাজনে যাবি কি যাবি না, সেটা এই ধাপে ডিসাইড করা হবে। তোর গায়ের রিসেপ্টরে গ্রোথ ফ্যাক্টর এসে বসল, খেলা শুরু। স্টাডি, নেট, অ্যাসাইনমেন্ট, এক্সাম একের পর এক বিক্রিয়া চলছে।
- ওয়েট, ছিলাম লাইক কোষ হয়ে, এসিপি মাঝে আসল কেন?

ভাইয়া বলে যেতে থাকল,

- ইন্টারফেজের মোটামুটি চল্লিশ পার্সেন্ট কাটে এই ফাস্ট গ্যাপে। এখন থেকে প্রায় মে মাস পর্যন্ত আমাদের চ্যালেঞ্জ চলবে, এই নতুন বছরের প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট, বুরুলি কেন এসিপি আসল মাঝে?
- আস্তে, সিন্যাপসগুলোকে সময় দাও।

ফেন্টন

- তোর টিমের এই যে আমি মেন্টর, আমি হলাম তোর সাইক্লিন প্রোটিন। মেসেঞ্জার কাইনেজে যুক্ত থেকে তোর খেলার গতি বাড়াব, বাড়াচ্ছি অলরেডি। তুই যেটা করছিস, বিভাজনের জন্য যেই কপি ডিএনএ লাগবে, এস ফেজে আবার সেটা বানাতে যা যা লাগবে, সমস্ত কিছু প্রস্তুত রাখছিস।
- লাইক এনজাইমস, প্রোটিন, মাসলম্যান ট্রাইফসফেট ভাইয়ারা?
- হ্যাঁ, তবে তোর ক্ষেত্রে টার্গেট হলো ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারা, ঝামেলামুক্ত বিভাজন না। কোষ হতে গিয়ে অপার ভাইয়ার কথাগুলো আবার খেয়ে ফেলিসনা। তো সেজন্য তুই এই ধাপে মূল বই থেকে যেভাবে যা কাঁচামাল প্রস্তুত করা সম্ভব, করে নিবি। এই চাল্লিশ পার্সেন্ট সময়ের মাঝেই এই ‘শক্তি উপাদান’ প্রস্তুত করে নিতে হবে। ফাস্ট ইয়ারের মত জি-ওয়ান ফেজ গেলে গেস হোয়াট? কী হবে?
- কী হবে?
- যাবজ্জীবন জি-ওয়ান ফেজ! স্বপ্নের বিভাজন স্বপ্নই থাকবে।
- প্রাইভে-

-তুই না কোষ? কোষের তো কোন প্রাইভেট বিভাজন নেই, সব পাবলিক, এইটের বাচ্চাও মাইটোসিসের ধাপগুলো জানে।

তো এই ধাপে সাইক্লিন হিসেবে বছরের শুরুতে তোকে কিছু অভ্যাসের কথা বলি, পারলে গো করবি। না পারলেও। কয়েকটা বিষয় নিয়মিত করে নে। ঘাঁটলে হয়তো অনেক অ্যাপ পাবি, রিমাইন্ডার, টু-ডু লিস্ট এইসব, আমি আমার কথা বলি, জাস্ট অ্যালার্ম, বিশটা তিরিশটা করে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতাম।

- আসলেই। একটা অভ্যাস নিজ থেকে গড়ে তুলতে গেলে নিয়মিত না হওয়াটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম। ভুলে যাই আরকি। অ্যালার্ম সেটা ভুলতে দিবে না। এটা ভালো ছিল।



- সায়েন্স ছাড়া আইসিটি, বাংলা-ইংলিশের জন্য তোর হয়তো শিডিউলড স্টাডি না হতে হতে সিলেবাস হয়ে গেছে ছোটগল্প, শেষ হয়েও হচ্ছে না শেষ, শুরু হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছেমত ডেইলি, উইকলি অ্যালার্ম দিয়ে রাখ। প্রতিদিন সব মিস হবে, সাতটা পনেরোতে পাঁচটা মডিফায়ার প্র্যাক্টিসে মিস হবে না। আমার এক ক্লাসমেট নিয়মিত ওয়ার্ড মুখ্যস্ত করছে বছরখানেক, হবে হবে ভেবে যেটা কিনা আমাদের কাছে রূপকথা।
- এইসব শুনিয়ো নাতো ভাইয়া। লাইক এভাবে সংজ্ঞা, সূত্র, ম্যাথ- সবকিছুর রূপকথার প্ল্যান সম্ভব।
- এই ধাপে মুখ্যস্ত টপিকের জন্য Ali Abdaal-এর স্টাডি টেকনিকগুলো দেখে নিস। যতটুকু পারা যায়। আমি ওগুলো জানার পর ট্রাইও করেছিলাম, আমার জুওলোজির অনেকগুলো অধ্যায়েরই অ্যাকটিভ রিকলিংয়ের প্রশ্ন খাতায় লেখা আছে, নিয়ে আসব একদিন। মাথায় গেঁথে যাবে।
- একটা জিনিস, একটানা স্টাডির মাঝের ব্রেকগুলা নিয়ে কী বলবা? লাইক চারদিন ঠিকঠাক গিয়ে মাঝে সারাদিন ঘুম।
- আন্তি কী করেন তখন? বলেন না কিছু?
- মা হলো গিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু, স্টাডি হলো নাকি হলো না দেখার বিষয় না, স্বাস্থ্য নিয়ে তার টেনশন।
- পরে নেক্রোসিস যেন না হয়, সেদিকেই খেয়াল রাখছেন।

ঘুম নিয়ে আলোচনা না আমাদের, তবু ঘুম পুরোপুরি রিলেটেড। রাত জেগে না পড়লে যদি স্টাডি হজম না হয়, সমস্যা নেই তো। জাস্ট শেষ রাতের ঘুমটা আগেই আই মিন প্রথমে সেরে নেয়া, জীবনের সকালটাকে কাজে লাগানো। এজন্য নতুন বছরে আর্লি টু রাইজ করে বডি ক্লক চেঞ্জ করতে পারিস কিনা দ্যাখ। পরামর্শ থাকবে, যত যা-ই হোক, আর্লি টু বেড যেন হয়, এটা না হলে ওটা রূপকথা।

আচ্ছা, স্টাডিকে প্রেশার না ভাবলে হয় না? খাওয়া-দাওয়ায়, ফ্যামিলির সাথে, চ্যাটে- আই মিন স্টাডির বাইরে বই থেকে একদম ছুটে যাস কেন? ফাঁকা সময় পেলে শেখা টপিক মনে করার ট্রাই করবি, কাউকে বোঝালে তো বেটার। সার্ফেস বাড়িয়ে প্রেশার কমিয়ে আন, পড়ালেখায় এনজয়মেন্ট আস্তে আস্তে বাঢ়বে। আরেকটা ব্যাপার, চোখে পড়ে এমন জায়গায়, যেমন ঘড়ির আশেপাশে নিজের স্পেসিফিক টার্গেটটা লিখে রাখতে পারিস, এক বন্ধুর অভ্যাস, প্রথমে এর গুরুত্ব বুঝিনি, ঘুম-দিবসে কাজে দেবে দেখবি।

- এস ফেজে যাচ্ছ কখন?

- জি-ওয়ানের লাস্ট, সারা ফেজের একটা ম্যাপিং রাখবি মাথায়। ফেন্টনের আমার এই এই চাপ্টারের বই কাভার হবে, ইনশাআল্লাহ, এমন। হোক না হোক, ভাল্লাগবে, হলে তো পৈশাচিক আনন্দ ফ্রি।

এস ফেজে বলার কী আছে? এক্সাম আর এক্সাম। টেস্ট, মডেল টেস্ট থেকে শুরু হবে, এইচএসসি ও হয়ে যেতে পারে, বাসায় বসে প্রশ্ন সলভ করা তো ওয়াজিব।

- ওয়েট, আমি মিলাই। লাইক সিনথেসিসে বেসপেয়ারের ডেটা কপি করা হয় নতুন স্ট্র্যাণ্ডে। এক্ষেত্রে আমরা প্রথম ধাপে শিখে আসা কাঁচামাল খাতায় কপি করে ‘শক্তি’ কাজে লাগাবো। চল্লিশ পার্সেন্ট সময় হয়তো এখানে চলে যাবে। একুশ ব্যাচ লাকি না আনলাকি, বোঝা আরকি মুশকিল।

- ধরে ফেলেছিস তাহলে। লাক বাদ দে আপাতত, কোষ হিসেবে থাক।
 এস ফেজের জন্য বছরের শুরু থেকেই এমসিকিউকে অভ্যাস হিসেবে নিতে পারিস।
 এই প্র্যাকটিসটা বোর্ডে কাজে তো লাগবেই, পরে কেমন লাগবে, নিজেও বুঝবি না।
 এখানে ব্যাপারটা কনসেপ্ট বোঝার না, ফুয়েন্সি আসার, যেটা পরে সিকিউ প্রশ্ন ক্যাচ
 করতে পর্যন্ত হেল্পফুল হবে। এক্ষেত্রে অ্যালার্ম-ফ্রি টাইম, যেকোন ওয়েতে শুরু করে দে
 এমসিকিউ সলভ। কাছে থাকা সব বই, গাইড, নতুন-পুরান টেস্ট পেপার দাগিয়ে ফ্যাল,
 লাইগেজ-লেভেলের কনফিডেন্স পাবি, কোনো ওকায়াকি আঙ্কেল বাকি থাকবে না। কিন্তু
 নিয়মিত করতে হবে।

- বছরের শুরু থেকেই শুরু করতে হবে আরকি।

- গ্রেট। আর বাকি আছে দশ-পনেরো ভাগ সময়, জি-টু ফেজে এসে পড়বি এবার। তুই
 এখন একটা পরিপক্ষ কোষ। যদিও ঝামেলা হলে এখানেও যাবজ্জীবন জি-টু। যাহোক,
 তোকে বিশ্ববিদ্যালয় থুকু বিভাজনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। ডবল ডিএনএ,
 ক্রোমোসোম, পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থাকলেও আরো কিছু স্ট্রাকচার তৈরী করতে হবে।
 আরো ‘শক্তি’ সঞ্চয় করতে হবে। জোড়া সেট্রোসোম থেকে মাইক্রোটিউবিউল হবে, তা
 দিয়ে হবে স্পিন্ডল যন্ত্র, তাতে ভেসে ভেসে তোর অস্তিত্বের বিলীন ঘটবে, ত্যাগেই সৃষ্টি,
 জন্ম নেবে নতুন কোষ, ভার্সিটিয়ান কোষ।

- আবেগে সব ত্যাগকে সৃষ্টি বলো না। সৎসঙ্গ ত্যাগ, গ্রিনহাউজ গ্যাস ত্যাগে উল্টো
 ধৰ্ম। এই ধাপের জন্য কোন অভ্যাসের কথা বলবে?

- এখনি ঐ ধাপের প্রতি অতি উৎসাহের অভ্যাস ত্যাগ করতে বলব। আগের দুই ধাপের অভ্যাস গ্রো না করে কেন যেন সবার এই অ্যাডমিশনে আগ্রহ। আরে, লালমোহনবাবু বলেছিলেন না, এন্স ওয়েল দ্যাট অলস ওয়েল?
- ভুলে গেছি, পড়ে দেখতে হবে আরকি।

- এইতো, ডোপামিন সমস্যার কথা বলিনি। এই ইন্টারফেজ থুকু ইন্টারমিডিয়েটের বাকি সময়টাতে এন্টারটেইনমেন্ট পজ রাখতে পারবি না? ফিড স্ক্রলিং, ইউটিউবিং, গেমস, সাহিত্য, টিভি, মুভি-ড্রামাকে স্টাডি-টপিক, সায়েন্স দিয়ে রিপ্লেস করে নে, বিশেষত লেইজারের সময়। তোকে কে ডিস্ট্রাক্ট করে এবার দ্যাখ।

- দেখি, ছাত্র হয়ে ক'ধাপ এগোই। আচ্ছা, এই পয়েন্টগুলো ফোটনে পাঠিয়ে দিই?

- ইচ্ছে। আচ্ছা, ফোটনের নিশ্চল ভর তো শূন্য। আমাদের ফোটনের সাথে এর মিলটা ধরতে পারছিস?

- নাতো, লাইক কিরকম?

- ফোটন বা ফোটনের পোস্ট না পড়ে রেখে দিলে, লেখা না পাঠালে, ডাউনলোড করে নিশ্চল রেখে দিলে ফোটন ভরহীন, যেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। গতিতেই ফোটনের সার্থকতা, হোক সেটা স্ক্রলিং করে পড়ে শেষ করার গতি।

ভাইয়া চলে যায়, আবার হয়তো আসবে, কিন্তু আজ রাতে বাকি থাকবে তিনশ’ চৌষট্টি দিন, যা গেছে গেছে, বাকিটা আর আসবে না। তবে ভাইয়া নতুন বছরে শুরু করার মত আরো কিছু অভ্যাস স্কিপ করে গেছে। ভাইয়া কোন অভ্যাসে দিনে পাঁচবার বাইরে বেরোয়, সেটা ‘ও’ নিজেই ভেবে নিক, ‘ফেরা’র কথা মনে হলে সেসব অভ্যাসও হয়তো ধরবে। কোষও ফেরে। মৃত কোষাবশেষ, হিউমাস, জাইলেম-ফ্লোয়েম, আবার সেই ফিরে আসা। এখনই না ধরুক, ধরবে কোনোদিন।



নিশান-৫৬৭৭

দেবাঞ্জন দেব রাতুল

এমসি কলেজ, সিলেট

"তুমি প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ"

ক্যাপ্টেন রঞ্জি-১৯৯৭ এর প্রশ্নের উত্তরে বললো নিশান-৫৬৭৭। এক দুঃসাহসী অভিযানে ট্রি-৫০ মহাকাশযানে যাত্রা করছে সে। গতব্য ০.৭ আলোকবর্ষ দূরে মিঞ্চিওয়ে গ্যালাক্সির সৌরজগত, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে সৌরজগতের নক্ষত্রিতের তৃতীয় গ্রহ। সেখানে প্রাণের স্পন্দন আছে বলে ধারণা করছে তারা। তারই খোঁজে স্পুটনিক-৫৬ গ্রহের অন্যতম সেরা মহাকাশচারীকে পাঠানো হচ্ছে। সে নিশান-৫৬৭৭।

যাই হোক, যখন স্পুটনিকের সাথে তাদের উপগ্রহ ৮০ ডিগ্রী কোণে চলে এল, নিশান মহাকাশযানের মূল ইঞ্জিনটা চালু করলো। ওরা সময় হিসাব করে এভাবেই। উপগ্রহের সাথে কোণের হিসাব।

নিশান দেখে নিল একবার তার প্রিয় লালচে গ্রহটিকে। গ্রহটা ঠিক বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার আকৃতির। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে সে। কবে ফিরবে কীভাবে সে জানে না। ওই প্রাণীগুলো যদি তাকে আটকে ফেলে? নিজের ফ্ল্যাজেলা দিয়ে সুইচ টেপে মোটর অন করার সাথে সাথেই উপরে উঠতে থাকলো মহাকাশযানটি। তারা ফ্ল্যাজেলা ব্যবহার করেই চলাচল করে। তাদের বৃত্তাকার দেহ হওয়ায় ফ্ল্যাজেলা ছাড়া চলা সম্ভবই নয় বলা চলে। তাদেরও অনুভূতি আছে, দুঃখ আছে, আনন্দ আছে। ক্যাম্পের সবার কথা ভেবে নিশানের বেশ দুঃখই হলো। ওরা থাকে ক্যাম্প করে। কাজ অনুযায়ী আলাদা আলাদা ক্যাম্প।

নিশান এসেছে মহাকাশচারী ক্যাম্প থেকে। ওদের বংশবিস্তার বিষয়টি একটু অন্যরকম। বার্থ মেশিনে সাধারণ সত্তা প্রবেশ করিয়ে দিলেই জন্ম নেয় অবিকল একটি স্পুটান (স্পুটনিকের অধিবাসী)। স্পুটানদের পার্থক্য নির্ণীত হয় বর্ণ, ফ্ল্যাজেলা সংখ্যা, বুদ্ধিমত্তা এসব দিয়ে। নিশান-৫৬৭৭, যাকে স্পুটনিকের ইতিহাসের অন্যতম বড় অভিযানে পাঠানো হচ্ছে, সে অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তার বুদ্ধিমত্তা যেকোনো স্পুটানের চেয়ে বেশি। তাই তাকেই পাঠানো হচ্ছে।

মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকলো। স্পুটনিকের বায়ুমণ্ডল এত ঘন নয়, কার্বন ডাই অক্সাইড প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ। স্পুটানদের জন্য তা সহায়ক, নিজের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম চালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানই সেটি। তবে একটি গ্যাস তারা সহ করতে পারে না, সেটি অক্সিজেন। অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই তাদের আবরণে আগুন ধরে যায়। মৃত্যু নিশ্চিত। ব্যাপারটি অবশ্যই ভয়ঙ্কর নিশানের জন্য। সে কোথায় যাচ্ছে, সে জানে না, জানার কথাও নয়, অজানা প্রাণের সংকেতকে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সে যাচ্ছে।

সায়েন্টিস্টরা কয়েক বছর ধরেই ধারণা করছেন সেখানে প্রাণী আছে, তারা কী রকম বা তাদের জীবনযাপন বা গ্রহটির বৈশিষ্ট্য কেমন, তা পর্যালোচনা করতেই পাঠানো হচ্ছে নিশানকে। এর আগে খালি মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল, সেগুলো সবই ব্যর্থ। তাই এবার যাচ্ছে স্পুটান, শুধু স্পুটান নয়, বুদ্ধিমান মহাকাশচারী স্পুটান নিশান। অন্তর্শস্ত্র ভালোই আছে, যুদ্ধ দরকার হলে অন্ত্রের অভাব তার হবে না। তারপরও অজানা ভীতি থেকেই যায়। স্টিয়ারিংটা ধরে যাত্রা শুরু করলো সে। বল্হ দূরের পথ। যদিও তার মহাকাশযানটি ঘণ্টায় যেতে পারে প্রায় ১.৫ লক্ষ কি.মি বেগে (পৃথিবীর হিসাবে)।



অনেক অনেক দিন পর...

হাঁ হাঁ, দেখতে পাচ্ছে, ওই তো অনেক দূরে নীলাভ একটা গ্রহ। বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে। সামনে আরো গ্রহ দেখা যাচ্ছে। সেগুলো প্রায় সব বৃত্তাকার, ঘুরে বেড়াচ্ছে উপবৃত্তাকার ভাবে মাঝে একটি উজ্জল নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। কি সুন্দর ব্যবস্থা! ভাবল নিশান। অটোপাইলট দিয়ে সে টিউবে নিজেকে অচল রেখেছিল অনেকদিন। প্লুটানদের আয়ু ৫০০-৬০০ বছর (পৃথিবীর হিসাবে) হয়। সাধারণত যখন তাদের মূল ক্লাস্টারটি(ব্রেইন) বিকল হয় তখনই তাদের মৃত্যু ঘটে। তাই নিশান নিজের ক্লাস্টারটি অচল রাখার জন্যই টিউবে বলতে গেলে ঘুমিয়ে ছিল এতদিন। এবার কাজ শুরুর পালা। মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার আলফা ২০-ই তাকে জাগিয়ে তুলেছে।

“উঠো, জাগো, দেখো এই সুন্দর সৌরজগৎকে!”

এগিয়ে চললো প্লুটান নিশান। হিসেব করে যা বুঝল, ওই নীলাভ গ্রহটি থেকে আর খুব একটা দূরে নেই সে। Astoroid look চালু করে দেয়ার সময় এখনই। এ ব্যবস্থায় ওই গ্রহের প্রাণী যদি থেকেও থাকে, তারা তার মহাকাশযানটিকে একটা উক্তার মত ভাববে। এটি স্পুটনিকের অন্যতম সেরা উদ্ভাবন। সেটি চালু করে যাত্রা করলো সে...

আরো ৬ দিন পর...

পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা দেখতে পেল, একটি উক্তা এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। একটি নয়, দুটি!

একটিকে বিজ্ঞানীরা চিনতে পারলেন। সেটিকে আগে থেকেই পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছিল। যদিও সেটির পৃথিবীতে আঘাত করার সম্ভাবনা ছিল কম। তবে দ্বিতীয় উক্তাটির কোন হিসেই তারা খুঁজে পেলেন না। এ কিভাবে সম্ভব!

যাই হোক, গ্রহটিকে বাঁচানোর উপায় খুঁজতে লাগলেন তারা। দ্বিতীয় উক্তাটি এত আস্তে এগিয়ে আসছে! উক্তাটির গতি স্বাভাবিক নয়, এটা তারা বুঝতে পারলেন। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, নাসার বানানো অন্যতম সেরা যন্ত্রটি ব্যবহার করা হবে। যেটি উক্তার গতিপথ পরিবর্তন করে দিতে পারে। কাজটি সোজা নয়। ঠিক করা হলো, প্রথম উক্তাটি, যার নাম এস্টেরয়েড-১৯৯৮, তার গতিপথ পাল্টে দ্বিতীয় উক্তার গতিপথের দিকে ছেড়ে দেয়া হবে। দুটো উক্তা সংঘর্ষে উড়ে গেলেই এ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে। সে অনুযায়ী পরিকল্পনা আরম্ভ করলেন বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে দেখা গেল, দ্বিতীয় উক্তাটির গতিবেগ অত্যন্ত কমে গিয়ে সেটি এখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার তাল করছে! অবাক করার মত বিষয় হলেও আগে পরিকল্পনা মাফিক কাজটা করতে হবে। পৃথিবী সময় ৩২২০ সালের ২০ জানুয়ারি, দ্বিতীয় উক্তার দিকে প্রথম উক্তাটির গতিপথ পরিবর্তনের যন্ত্রটি স্পেস স্টেশন থেকে তার কাজ শুরু করলো। এক বিশেষ রশ্মির মাধ্যমে প্রথম উক্তাটির নিয়ন্ত্রণ নিল স্পেস স্টেশনের যন্ত্রটি।

নিশানের উদ্দেশ্য ছিল গ্রহণকে প্রদক্ষিণ করে বোঝার চেষ্টা করা, প্রাণের অস্তিত্ব আসলেই রয়েছে কিনা। সে কাজে ঠিকই সফল সে, সে দেখতে পেয়েছে নীল বায়ুমণ্ডল, গ্রহটির পৃষ্ঠে অধিকাংশ অংশ জুড়ে উপস্থিতি রয়েছে একটি পদার্থের, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে তৈরি! স্পুটনিকের অন্যতম শক্তিশালী টেলিস্কোপ ও ম্যাটার আইডেন্টিফায়ার দিয়ে সে তাই বুঝেছে। হ্যাঁ, অক্সিজেন। এমনকি গ্রহটার বায়ুমণ্ডলে কিসের আধিক্য থাকতে পারে সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছে। সেই আশঙ্কা থেকেই সে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ...

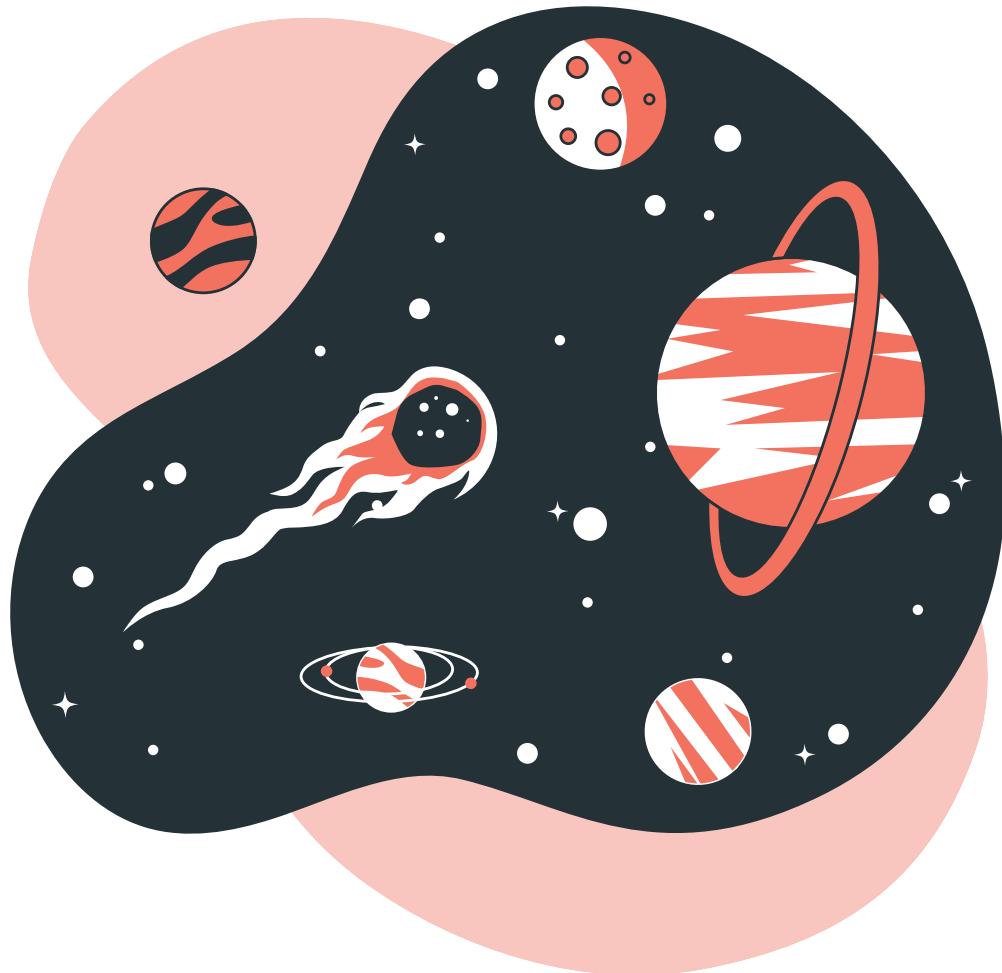
আকস্মিক একটি উচ্চা ধেয়ে আসতে দেখা গেল। না, এটা হতে পারে না, তার মনিটরে আগে সেরকম উচ্চার আগমন দেখায়নি। তবে কি ওই গ্রহের প্রাণীদের প্রেরিত কোনো বস্তু? ওর কি এস্টেরয়েড শেপ নেয়াটা ভুল হলো? স্টিয়ারিং ধরে মূল কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সে স্পুটনিকে যোগাযোগ করলো। ক্যাপ্টেন অন্তর্গুলো ব্যবহার করতে বললেন। নিশান কিছুতেই রাজি হলো না, অজানা গ্রহের প্রাণীদের কোনরূপ ক্ষতি করতে চায় না সে।

সাথে সাথেই গতিপথ পরিবর্তন করলো নিশান, কাটাতে চেষ্টা করলো উচ্চাটিকে। গতি বাড়িয়ে দিল। ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল নীলাভ গ্রহটার সাথে দূরত্ব। যখন সে বুঝতে পারল এবার সে বিপদমুক্ত ও মহাকাশযানটি ঘোরাতে হবে, ততক্ষণে সে পৃথিবীর আকর্ষণে পতিত হয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে স্পুটনিকের এত ধারণা নেই, গ্রহটির আকর্ষণ বল নেই ই বলা চলে, তারা থাকে ফ্লাইং স্টেশনে। তাও এন্টিফোর্স মোটর ছিল। সেটা সে চালুও করলো। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে, পৃথিবীর দিকে পতিত হতে থাকলো মহাকাশযানটি। শেষ চেষ্টা করার চেষ্টা করলো নিশান, মহাকাশযানটির এন্টিফোর্স পুরোটাই চালু করে দিল। ওদিকে তীব্র ধাক্কায় মহাকাশযানের মূল মোটরটা বিকল হয়ে গেল শেষ প্রান্তে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর এক স্থানে আছড়ে পড়লো মহাকাশযানটি। তার পূর্বেই বাতাস তুকে পড়েছে যানটিতে। নিশানের সিটটি এখন শূন্য। কেউ নেই তাতে। অস্তিত্ব নেই কোন স্পুটানের এ মহাকাশযানে। অক্সিজেন এর ক্রিয়ায় ঘটনাটি ঘটতে সময় বেশি প্রয়োজন হয় নি। নিশানের শেষ কিছু কথা তখন ছুটে যাচ্ছে স্পুটনিকের দিকে।

পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেবার বুঝতে পারেননি, কেন তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। কেন উক্ষাটিকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা উক্ষাট? প্রথম উক্ষাট এত অস্বাভাবিক আচরণ ই বা কেন করছিল? তবে কি সেটা ভিন গ্রহের প্রাণীদের কিছু? উক্ষাট আঘাত করার পরও কোথায় হারিয়ে গেল? এসব প্রশ্নের জবাব পাননি তারা।

স্পুটনিকে নিশানকে অন্যতম সাহসী বীর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। প্রতি মুহূর্তেই তার সাথে যোগাযোগ রেখেছিল তারা। নীলাভ গ্রহটিতে প্রাণের স্পন্দন আছে, সে এটা নিশ্চিত হতে পেরেছিল। মহাকাশযান বিধ্বস্ত হবার আগে সে মডিউলে জানিয়ে গিয়েছিল, “এ গ্রহে প্রাণ আছে। তবে আমি নিজের ভুলেই প্রাণ হারালাম। আমাকে আঘাত করার পরিকল্পনা তাদের ছিল না।”

এরপর আর যোগাযোগ সম্ভব হয়নি নতুন গ্রহটিতে। পুনরায় স্পুটান পাঠানো আর হয়নি স্পুটনিক নামক গ্রহটি থেকে।



গ্রাফিন - প্রযুক্তি জগতের উবিষ্যত

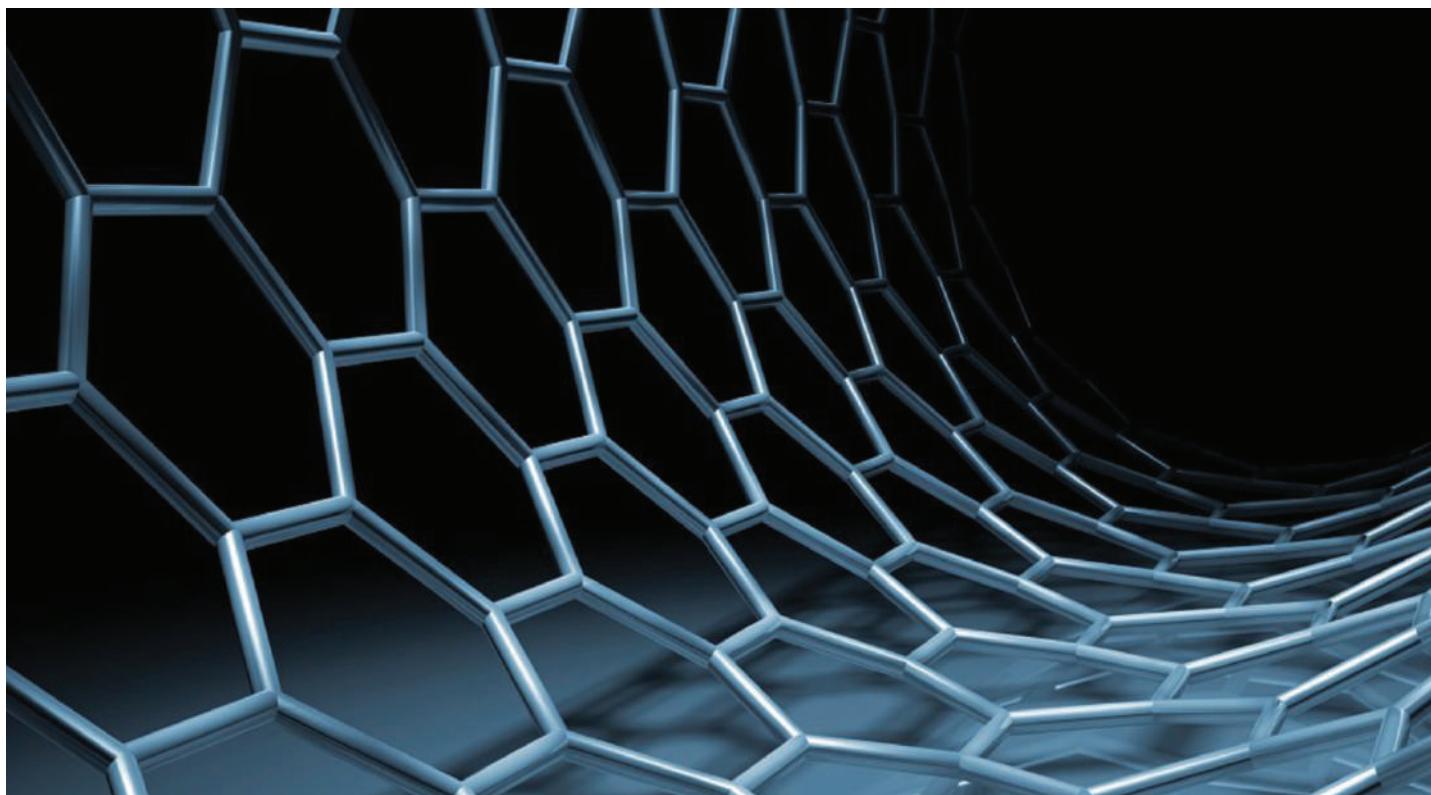
রাহিদা হক

চট্টগ্রাম কলেজ,
চট্টগ্রাম

এক মিলিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সমান কোনো উপাদান দিয়ে বিপ্লব?
কিভাবে সম্ভব?!

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বব্যাপী ন্যানোপ্রযুক্তিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অতিক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক, ন্যানোউপকরণ (nanomaterial) হলো গ্রাফিন (graphene)। বিশ্বের সর্বপ্রথম দ্বিমাত্রিক এই উপকরণটির ব্যাপারে আমরা অনেকেই হয়তো জানি না। তবে এতটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, খুব শীত্বাই এটি বিশ্বব্যাপী বায়োইঞ্জিনিয়ারিং, অপটিক্যাল ইলেক্ট্রনিক্স সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদায় পরিণত হতে যাচ্ছে।

Diamond এর চেয়ে কঠিন, রাবারের চেয়ে নমনীয়, স্টিলের চেয়ে শক্ত, অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে হালকা এই ন্যানো উপকরণের উপযুক্ততা এতোই বেশি যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্রাফিনের ব্যবহার ও গবেষণার পিছনে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছেন।



এবার আসা যাক গ্রাফিনের পরিচয়ে। গ্রাফিন হলো কার্বনের একটি রূপভেদ (allo-trope), যা মৌচাকের জালির (lattice) ন্যায়, দ্বিমাত্রিকভাবে বিন্যস্ত, একস্তরী পরমাণু নিয়ে গঠিত।

গ্রাফিন শব্দটি জার্মান গ্রাফাইট (graphite) থেকে আগত। শেষের -ene প্রত্যয় নির্দেশ করে কার্বনের আরেক রূপভেদ। গ্রাফাইট মূলত একস্তর গ্রাফিন লেয়ার নিয়েই গঠিত।

গ্রাফিনের কাঠামো

এই ন্যানোউপকরণটি ঠিক কতটুকু ক্ষুদ্রতর তা জানলে হয়তো আপনারা অবাক হবেন। 1 nm (১ মিলি মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ) পুরু গ্রাফাইটে প্রায় ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লক্ষ গ্রাফিনের লেয়ার থাকে! শুধু তাই নয়, এটি এতটাই হালকা যে, ২৬৩০ বর্গ মিটার গ্রাফিনের ভর মাত্র ১ গ্রাম। অর্থাৎ, ৩ গ্রাম গ্রাফিন দ্বারা একটি ফুটবল মাঠ ঢেকে দেওয়া সম্ভব!

আবিষ্কার

Andre Geim, একজন ডাচ-ব্রিটিশ (জন্ম: রাশিয়া) পদার্থবিদ এবং ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টারের প্রফেসর, সর্বপ্রথম কার্বন থেকে দ্বিমাত্রিক এই পরমাণু স্তরটি আলাদা করতে সক্ষম হন। তিনি আগুবীক্ষণিক যন্ত্রের নিচে এর ষড়ভুজাকৃতির গঠনটি দেখতে পান।

পরবর্তীতে, শিক্ষার্থী Konstantin Novoselov এর সাহায্যে বিস্তর গবেষণার পর গ্রাফিনের ব্যাপারে চমকপ্রদ সব তথ্য আবিষ্কার করেন।

>> গ্রাফিনের অনন্য গঠনের জন্য এর পরমাণু জালিকা (lattice) এর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন অসাধারণ গতিতে, বাধাহীনভাবে প্রবাহিত হতে পারে। তাছাড়া এটির উচ্চ ইলেকট্রন Mobility (গতিশীলতা) সিলিকনের তুলনায় ১০০ গুণ বেশি।

>> হীরার চেয়েও গ্রাফিন ২ গুণ বেশি তাপ পরিবহন করতে পারে।

>> কপারের তুলনায় এটি ১০০০ গুণ বেশি বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে।

>> স্টিলের তুলনায় এটি ১৫০ গুণ বেশি শক্তি।

>> নিজের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ১২০% প্রসারিত করা সম্ভব।

>> এটি এতোটাই অভেদ্য যে, এমনকি ক্ষুদ্রতম পরমাণু Helium-ও এর মধ্য দিয়ে পার হতে পারে না।

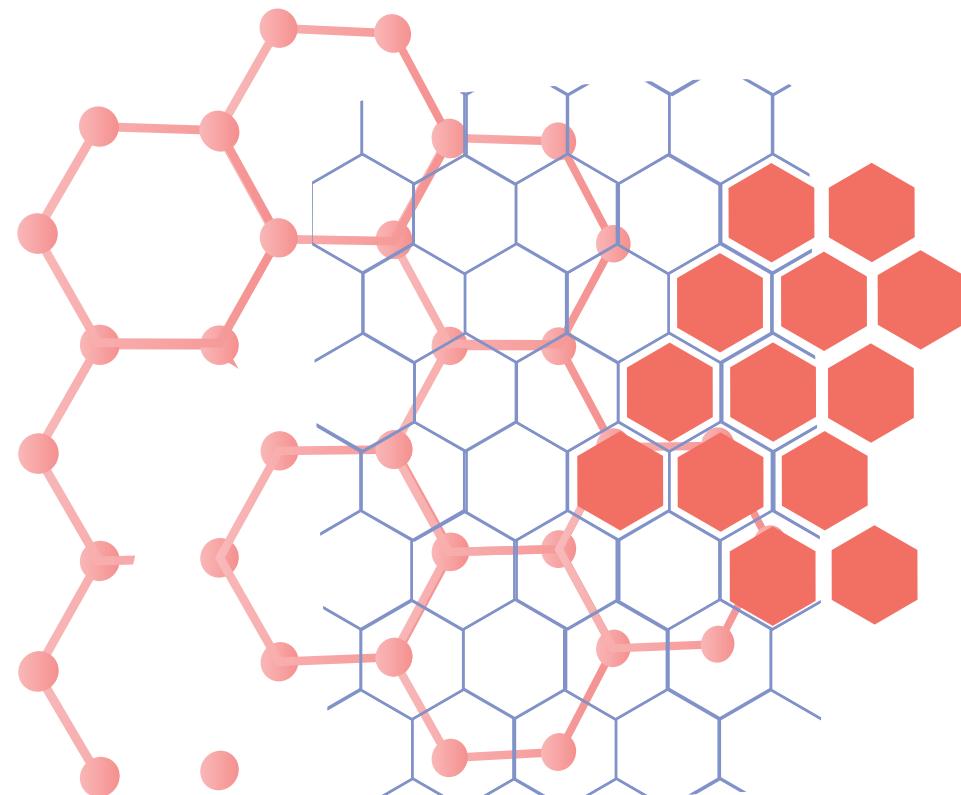
ব্যবহার

বায়োলজিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দ্রুতগামী ও কার্যকর বায়োইলেক্ট্রিক সেঙ্গরি ডিভাইস তৈরিতে গ্রাফিনের মতো উচ্চপরিবাহী, মজবুত উপকরণের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া একে এন্টিবায়োটিক হিসেবে ও ক্যাপার প্রতিরোধে ব্যবহার করা যায়। এমনকি এর আণবিক গঠন ও উপযুক্ততার জন্য একে টিস্যু পুনর্গঠন (tissue regeneration) এর কাজে ব্যবহার করা যায়।

অপটিক্যাল ইলেক্ট্রনিকস: টাচস্ক্রিন, LCD, organic LED তৈরিতে এর ব্যবহার করা যায়। এটি স্বচ্ছ হওয়ায় অপটিক্যাল ভাবে ৯৭.৭% আলোক প্রেরণ করতে সক্ষম।

শক্তি সংরক্ষণ (Energy storage): ব্যাটারি কিংবা ক্যাপাসিটরে শক্তি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হলো, ব্যাটারি প্রচুর শক্তি সংরক্ষণ করতে পারলেও এটি চার্জ হতে সময় লাগে অনেক এবং ক্যাপাসিটর তাড়াতাড়ি charged হলেও বেশি শক্তি ধরে রাখতে পারে না। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গ্রাফিন ব্যবহারের জন্য গবেষণা চলছে।

এছাড়াও পানি পরিস্থাবণ (water ultrafiltration), কম্পিউটার তৈরি, জটিল যৌগ (Composite material), photovoltaic cell ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বিপুল চাহিদা রয়েছে।



বিনিয়োগ: বিশ্ব বনাম বাংলাদেশ

গ্রাফিন তৈরি, ব্যবহার ও গবেষণার কাজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। ব্রিটিশ সরকারের ৬০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে National Graphene Institute গড়ে উঠেছে। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন সহ অন্যান্য দেশে গ্রাফিন কোম্পানি রয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও এদেশে ন্যানোপ্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও ব্যবহারের বিষয়ে যথার্থ দিকনির্দেশনা ও বিনিয়োগের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ও গার্মেন্টসে ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহারের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু গ্রাফিনের ব্যবহারে এখনো এদেশ পরিচিতি পায়নি।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রাফিন হলো একুশ শতকের বিস্ময় উপকরণ। এই ন্যানোম্যাটেরিয়ালটি ভবিষ্যৎ বিশ্ববাণিজ্যকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করতে যাচ্ছে। তবে তার জন্য এখনও বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন। একুশ শতকের বাণিজ্যকে সহজতর, লাভজনক করার লক্ষ্যে গ্রাফিন আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়।

তথ্যসূত্র :

<https://www.newyorker.com/magazine/2014/12/22/material-question>

https://www.nanowerk.com/what_is_graphene.php

<https://www.graphenea.com/pages/graphene-uses-applications>

<https://investingnews.com/daily/tech-investing/nanoscience-investing/graphene-investing/investing-in-graphene-companies/>

<https://www.banglajol.info/index.php/JCE/article/view/34800>

নীল নয়নে ১৭ খুলি

পর্বঃ ০১

মামছিয়া আফরিন

গভঃ হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম



রহস্য। মাত্র তিনটে বর্ণ। কিন্তু এর পরিধি কতটা ব্যাপক হতে পারে তা জানা কঠিন। আর এই কঠিন আরও কঠিনতর হয়ে উঠে, যখন তা উন্মোচনের পথ পেয়ে যায়। কিন্তু সে তো উন্মোচিত হবার নয়।

"ডামার, তুমি তোমার এই মদ্যপানের নেশা কখন ছাড়বে?", দাদীর কাছ থেকে কথাটা শুনে ডামার কোনো প্রতিক্রিয়া করলো না। কেবল লেবুর শরবত পান করে নিজের নেশা কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলো।

"ডামার, আমি তোমাকে নিয়ে সত্যি আর পারছি না। তুমি তোমার বাবার কাছে শীঘ্ৰই চলে যাও। তোমার সৎমা আর যা-ই হোক তোমার ক্ষতি করবে না। এসব লেইট নাইট পার্টি বুড়ো বয়সে আমার সহ্য হচ্ছে না।"

এবারও ডামার কোনোরূপ শব্দ না করে বেইজমেন্টের দিকে চলে যায়। প্রতিদিনকার মতো গতকাল রাতেও সে মদ্যপান করে এসেছিল। কিন্তু কালকে রাতের ব্যাপারটা অনেক ভিন্ন। কারণ আজ একা নয়, টওমি, তার সমকামিতার সঙ্গী আছে, যে কিনা গতকাল তার প্রাণ হারিয়েছে। ইচ্ছা পূরণ করতে না দিলে তো ডামার জোর করে নিতে জানে। সে এবার আস্তে আস্তে নিজের পশুকামিতাকে মৃতদেহের দ্বারা সন্তুষ্ট করতে থাকে। আহা! কত দিন পর সেই আনন্দ। তার চোখ যেন আগন্তের মত চকচক করছে।

রাত ২.১৫ মিনিট। ডামার তার হাতে একটি বিরাট স্যুটকেস নিয়ে 'Walker Street'-এ গাড়ি চালাতে থাকে। তার একটাই লক্ষ্য, যেভাবে হোক তার পশুকামিতার সঙ্গীর অঙ্গুলো হারানোর ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে। কাজটা সেরে যখন সে বাসায় ফিরছিল, এক সুদর্শন তরুণ তার মনকে আবার নাড়া দেয়। মদ্যপানের নেশায় আসক্ত হয়ে তরুণটি গাড়ির চাবি খুঁজছিল। একবার পকেটে হাত দেয় আবার গাড়ির তলায় খোঁজে। ব্যাপারটা বারবার ঘটতে থাকলে ডামার তার সামনে যায়।

"কী খুঁজছেন এতো রাতে?"

ডামার কথাটি বলে কিছুটা দাঁত বের করে নিজের মধ্যকার 'মিলাউকি কানিবাল'কে

লুকাতে চেষ্টা করে। সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নীল চোখেও ফর্সা রগ বের করা গওদেশের চাইতেও গোলাপী ঠেঁট যেন ডামারকে হাতছানি দিচ্ছে বার বার।

"আ-আমি আমার চাবি পাচ্ছি না। আপনি কি আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দিবেন?", ডামারের চোখ যেন ছলছল করে উঠলো। নিজের উৎসাহকে কিছুটা নিবারণ করে বললো, "অবশ্যই। আসুন আমি আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিই।"

তরুণটি তার কথায় রাজি হয়ে গাড়িতে উঠে যায়। এবার ডামারের কাছে নিজেকে নরখাদকের পাশাপাশি বেশ সুদর্শনও লাগছে। এই প্রথম কোনো সুন্দর তরুণ এভাবে ডামারের কাছে আসলো। এবার হয়তো তার খুলি বেইজমেন্টে নিতে হবে না। ওইদিন ও যদি ছোটকালের বন্ধু সুলিলের সাথে থাকতো তাহলে কি এভাবে অকালে প্রাণ দিতে হতো? আজও সেই ডাম্বেল সংরক্ষিত আছে, কারণ স্মৃতি যে ভুলানো যায় না। আর তাও যদি হয় প্রথম খুনের? মাথার খুলিটা রাখা যেতো কিন্তু নেশা তাকে সেগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল।

নির্জন রাস্তার দিকে নিয়ে গেলে ছেলেটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে ডামার আরও খুশি হয়ে যায়। "এবার তো তাহলে কোনো জবরদস্তি ছাড়াই হয়ে যাবে দেখছি।" কিন্তু শারীরিক চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতে থাকলে তরুণটি ডামারকে চড় মেরে বের হয়ে যায়।

"ওহ শিট! এবার তো জোর করেই আদায় করতে হবে দেখছি!" বলেই যখন ডামার জোরপূর্বক তরুণটির গা হাতরাচ্ছিল-

ঠিক তখনই পুলিশের গাড়ি এসে ডামারের সব প্ল্যান ভেঙ্গে দেয়। গাড়ি থেকে বের হয়ে এক পুলিশ তরুণের সব কথা শুনে ডামারকে থানায় নিয়ে যায়। আর সেখানেই ডামারের তিনি বছরের জেল হয়ে যায়।

"আংকেল, তাহলে তো ডামার মাত্র দু'টি খুন করলো? ১৭টা খুলি কিভাবে পেয়েছে সে?", নির্জন পার্কের সেই ছেট্ট স্বরটি যেন চারদিকে ছেয়ে গেল।

"এখন কি হবে?"

লেখাটি দুই পর্বে সমাপ্ত হবে। পরবর্তী সংখ্যায় এর দ্বিতীয় পর্ব দেওয়া হবে।

ফ্রেটন

THE DEEPEST PLACE ON EARTH

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ
- কোতুহল নাকি রহস্য?

লাবিবা মালওয়া ইমলাম
সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

UNVEILED

পশ্চিম আকাশে সূর্যটা রোজ হেলে পড়ে। পরদিন নতুন উদ্যমতায় নিজ তেজে সে বিশাল আকাশের পূর্ব পাশটায় প্রকাশিত হয় রাজার বেশে। সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে শুরু করে উদিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টাতে অনেক কিছুই ঘটে। সবকিছুর ব্যাখ্যা হয়তো আমাদের কাছে থাকে না। কিন্তু মানুষ জাতি নতুন কিছুর সন্ধানে থাকে। কখন এক বিস্ময় সৃষ্টি করবে তার আয়োজনে ব্যস্ত। এরকম কতো বিস্ময় আজ উন্মোচিত হয়েছে, আর তার আড়ালে হাবুড়ুরু খাচ্ছে সমাধান না পাওয়া হাজারো রহস্য।

যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোনটি?" বেশিরভাগেরই এর উত্তর জানা। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "পৃথিবীর গভীরতম স্থান কোনটি?" অনেকের কাছে হয়তো এর উত্তর নেই।

'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ' পৃথিবীর গভীরতম স্থান। যা পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় ও রহস্যের প্রাণকেন্দ্র। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত 'মারিয়ানা' দ্বীপপুঞ্জের নামানুসারে এই স্থানের নাম রাখা হয় "মারিয়ানা ট্রেঞ্চ"। আর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব দিকে অবস্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চের। এর দৈর্ঘ্য ২,৫৫০ কিলোমিটার ও প্রস্থ ৬৯ কিলোমিটার।

এখানকার সবচেয়ে গভীর অংশটির নাম "চ্যালেঞ্জার ডিপ"। বিজ্ঞানীদের মতে এটি প্রায় ১১ কিলোমিটার বা ১১,০০০ মিটার গভীর। তবে এর গভীরতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো সন্দিহান। এই জায়গাটি আরো গভীর হতে পারে।

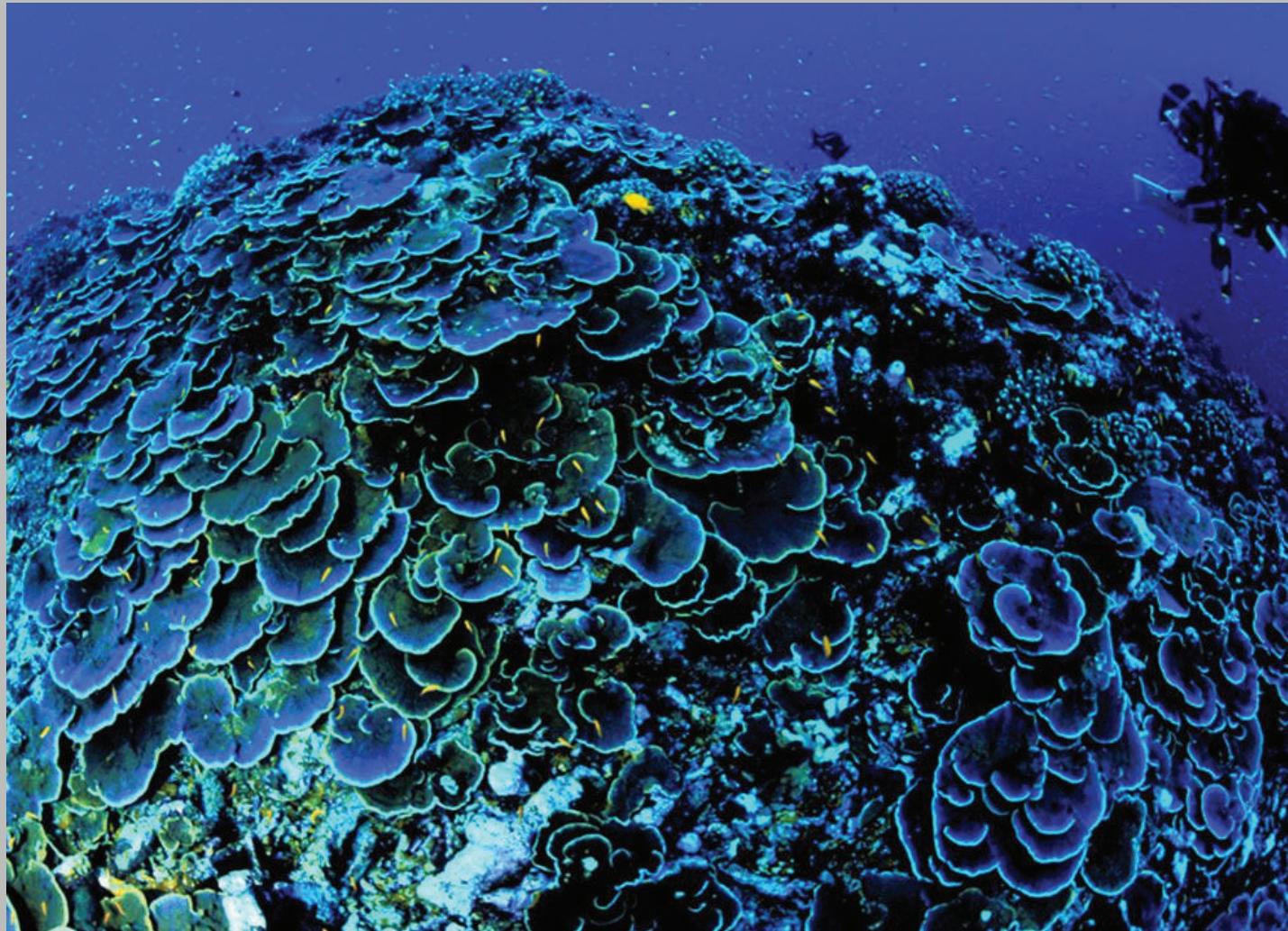


এটি আবিষ্কারের গল্পটা জানা যাক। ১৯৪৮ সালে একদল নাবিক ‘এইচএমএস চ্যালেঞ্জার’ নামের জাহাজে চড়ে মূলত এই বিন্দুটি আবিষ্কার করে। তাই এর নাম দেয়া হয় ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’।

কিভাবে এই মারিয়ানা ট্রেঞ্চ সৃষ্টি হলো? এটি সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি কেমন ছিলো? এর উত্তরে বলা চলে- অধোগমন নামক ভৌগোলিক প্রক্রিয়ায় এর সৃষ্টি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের সঙ্গে ফিলিপিন প্লেটের সংঘর্ষের ফলে বিশালাকৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট ফিলিপিন প্লেটের নিচে চলে আসে। আর এভাবেই প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে জন্ম নেয় এই গভীর ট্রেঞ্চ।

কি? অবাক লাগছে? এতোটা গভীর? একটা উদাহরণ দেয়া যাক। মাউন্ট এভারেস্টের পুরোটা যদি তুলে এনে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’-এ ঢুবিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু এভারেস্টের চূড়াটাও সমুদ্রের উপর থেকে দেখা যাবে না। বরং ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’ এতটাই গভীর যে আস্ত এভারেস্টটা রাখার পরেও উপরে আরো জায়গা রয়ে যাবে। এবার নিশ্চয়ই এর গভীরতা সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারছেন। অবাক করার মতো হলেও এটাই সত্যি।

কারো কি প্রশ্ন জাগে? এতো গভীর স্থানে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব কি আদৌ রয়েছে? জেনে আসা যাক। ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত জাহাজ ‘ভিতিয়া’ প্রথম ‘চ্যালেঞ্জিং ডিপ’-এ প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ১৯০০ মিটার গভীরে প্রাণের অস্তিত্ব পায়। আরো মজার ও অদ্ভুত বিষয় হলো- ১৯৬০ সালে ইউএস নেভির লেফটেন্যান্ট ডন ওয়ালশ ও জ্যাকুস পিকার্ড প্রথম মারিয়ানা ট্রেঞ্চের তলায় অবতরণ করেন। এরপর ১৯৬৬ সালেও মানুষ অবতরণ করেছে ভয়ংকর এ স্থানে।



মারিয়ানা ট্রেঞ্চে কি আদৌ কোনো অদৃশ্য শক্তি রয়েছে? ১৯৮৫ সালে আমেরিকান একদল রিসার্চ টীম ‘গ্লোমার চ্যালেঞ্জার’ থেকে রহস্য উদ্ঘাটনের সময় ‘হ্যাচ হক’ নামের একটি ডিভাইস প্রবেশ করায়, যা ‘চ্যালেঞ্জিং ডিপ’ এর শব্দ পরীক্ষা করে। কিছু সময় পর কোনো এক অদ্ভুত কারণে তাদের মনে হতে থাকে, হ্যাচ হকের ক্যাবলটি অদৃশ্য কোনো শক্তি নিচের দিকে টানছে। অবশেষে ঐ রিসার্চ টীম তিন ঘণ্টা পর ডিভাইসটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এরপরের ঘটনাটি গা হিম করে দেয়ার মতো! ‘হ্যাচ হক’ এর বডিতে দেখা যায় দাঁতের কামড়ের মতো স্পষ্ট কিছু দাগ। সর্বশেষ

মারিয়ানা ট্রেফকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছে দুঃসাহসিক কিছু মানুষ। সূর্যের আলো সমুদ্রের তলদেশে ১০০০ মিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তাই ‘চ্যালেঞ্জিং ডিপ’ এর মধ্যে সূর্যের আলো পৌঁছানোর প্রশ্নই উঠে না। এছাড়াও এখানে জলের ঘনত্ব স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি এবং উষ্ণতা ১-৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র। আর সবচেয়ে অঙ্গুত এবং অবাক করার বিষয় হলো, কল্পনাকে সত্য প্রমাণ করেছে বিজ্ঞানীরা। রিমোটলি অপারেটেড ভেহিক্যালের মাধ্যমে এই ডিপে পেয়েছে ভয়ঙ্কর সব প্রাণের অস্তিত্ব, প্রাণৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের অস্তিত্ব। এদের নামগুলো না বললেই নয়- ‘ডাস্বো অক্টোপাস’, ‘ফিল্ড শার্ক’, ‘সার্কাস্টিক ফ্রিঞ্জহেড’, ‘হ্যাচেট ফিস’। দুঃসাহসিকেরা এখানে ২.৬ মিলিয়ন বছর আগের সমুদ্রের রাজাদেরও (হোয়াইট শার্ক) অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। মারিয়ানা ট্রেফ আজো বিস্ময়। পৃথিবীর কৌতুহলগুলোর মধ্যে অন্যতম।

প্রকৃতি রূপ বদলায়। কখনো আপনাকে রহস্য উদ্ঘাটনে আগ্রহী করে তুলবে, কখনো এনে দিবে অমৃতের ন্যায় তৃষ্ণি, কখনো হাজির হবে ভয়ঙ্কর রূপে। হ্যাঁ, এটাই প্রকৃতি, এটাই শান্তির মানে, এটাই কষ্ট, এটাই তৃষ্ণি।



হারখানা কোথায় ?



আজকের পত্রিকা টা খোলার পরপরই একটা খবর দেখে আমি চমকে উঠলাম। "বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীমতী কৌলকী রয়চৌধুরি মারা গিয়েছেন, গতকাল রাত ৯.৩০ ঘটিকায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। যদিও তার মেয়েরা মনে করছে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়....." সাথে সাথে অনুদি কে ডাকলাম, "অনুদি জানিস...." কথা টা শেষ করবার আগেই বলল, "মিসেস রয় চৌধুরীর কথাই বলবি? ওইটা আমার আজ খবরের কাগজ দেয়ার সাথে সাথেই দেখা হয়ে গেছে। আর তার চেয়ে বড় খবর সাব ইঙ্গেলেন্সের জহরলাল বাবুও ফোন করেছেন।" কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগে দিদি বলল, "আমি একটু ঘটনা স্থলে যাচ্ছি। গেলে তৈরি হয়ে নে।"

"তা আগে বলতে, পাঁচ মিনিটে আসছি।"

তারপর ট্যাঙ্কিতে করে পৌঁছে গেলাম চন্দন স্ট্রীট। গিয়েই জহর বাবু কে খুঁজে বের করলাম। উনার কথায় যা বুবলাম, মিসেস কৌলকী রয়চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা টা তার নিজের না, তার স্বামী আনুপলাল রয়চৌধুরীর। তিনি মূলত আনুপলালের দ্বিতীয় স্ত্রী। মিসেস রয়চৌধুরীর নিজের কোনো সন্তান ছিলো না। তার স্বামীর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে কে তিনিই মানুষ করেছেন। বড় মেয়ে সাধনা এবং ছোট মেয়ে সুমনা। সাধনার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তার এক ছেলেও আছে। ওর নাম প্রাণ। ছোট মেয়ে সুমনার বিয়ে উপলক্ষ্যে তার বড় মেয়ে এ বাড়িতে এসেছে। বিয়ের গয়না নিয়ে আলোচনা চলাকালীন সময়ে মিসেস রয়চৌধুরী তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী হার আনতে নিজের ঘরে যান। অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ফিরে না আসায় তারা উপরে গেলে মাকে মৃত অবস্থায় পায়। এবং লকারটার যেখানে হার টা থাকতো সেখানে একটি চিরকুট

পায় মিসেস রয়চৌধুরীর হাতে লিখা। তার মেয়েদের ধারণা, হারের জন্যই তাদের মাকে মারা হয়েছে। মেয়েরা মিসেস সেন কে সন্দেহ করছে। মিসেস সেন হলো সাধনার মাসী এবং তিনিই প্রধান সাসপেন্ট। কিন্তু তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ তাদের হাতে নেই। পুলিশও মনে করছে তিনি নির্দোষ। তাদের মতে হারটা পেলে ঘটনার অনেকটাই পরিষ্কার হতো।

দিদি চিরকুট টা চাইলো। তাতে লিখা,
"প্রাণ ভরে গেছে শিউলি ফুলের দ্রাগে। হলো মাতোয়ারা এই জলের ফোয়ারা।
তার মাঝে খুঁজে বেড়াই রহস্যের সমাধান।"

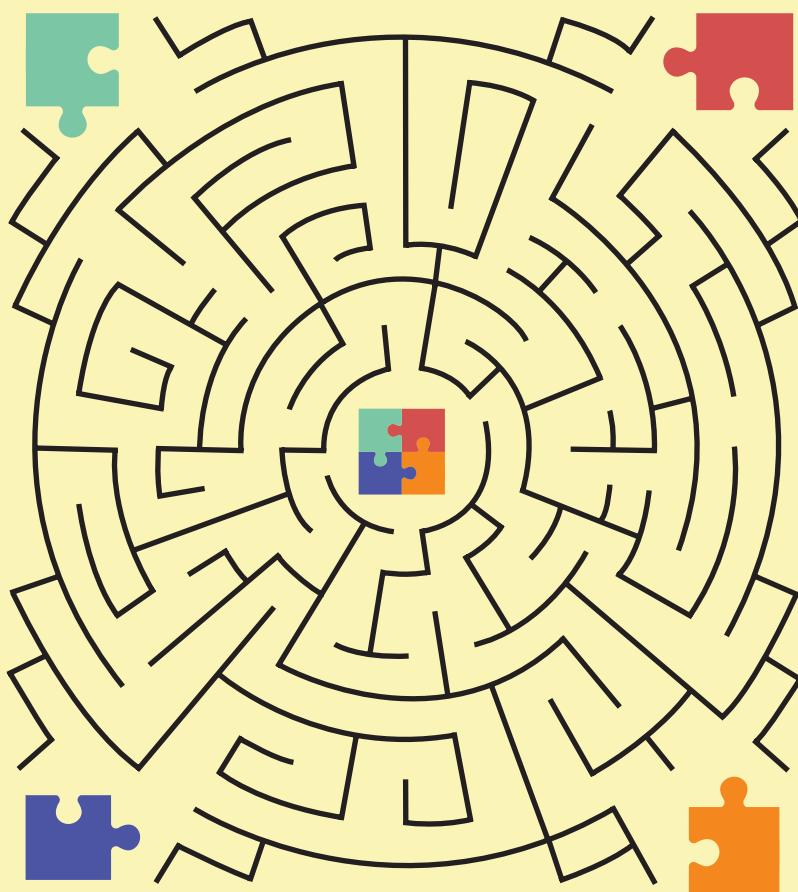
কোথায় শিউলি ফুল আর কোথায় গলার হার?! আর সাধনা আর সুমনার তার আপন মাসীর চাইতে সৎমার প্রতি এত ভালোবাসা কেন? হার্ট অ্যাটাকের এ মৃত্যু কেন অস্বাভাবিক লাগছে তাদের কাছে। এই সহজ সরল কেস টা এতো প্যাঁচানো কেনো মনে হচ্ছে আমার কাছে। অনুদিও কি তাই ভাবছে??

এটাই ছিল আমাদের পাঁচ অধ্যায়ের গল্পের প্রথম অধ্যায়। পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় অধ্যায়, যেটা লিখবে তোমরাই। অর্থাৎ একাধিক লেখকের সমন্বয়ে পূর্ণতা পাবে আমাদের গল্প। যদি তুমিও একজন লেখক হতে চাও তাহলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্যে ২০০ শব্দের মধ্যে তোমার লেখা আমাদের ইমেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দাও। বিজয়ীর নাম আমাদের ASG ফেসবুক গ্রুপে ঘোষণা করবেন 'নুমেরি সাতার অপার' ভাইয়া।

আমাদের লেখা পাঠাতে এই বক্সে ক্লিক করো

গোলকধাঁধা

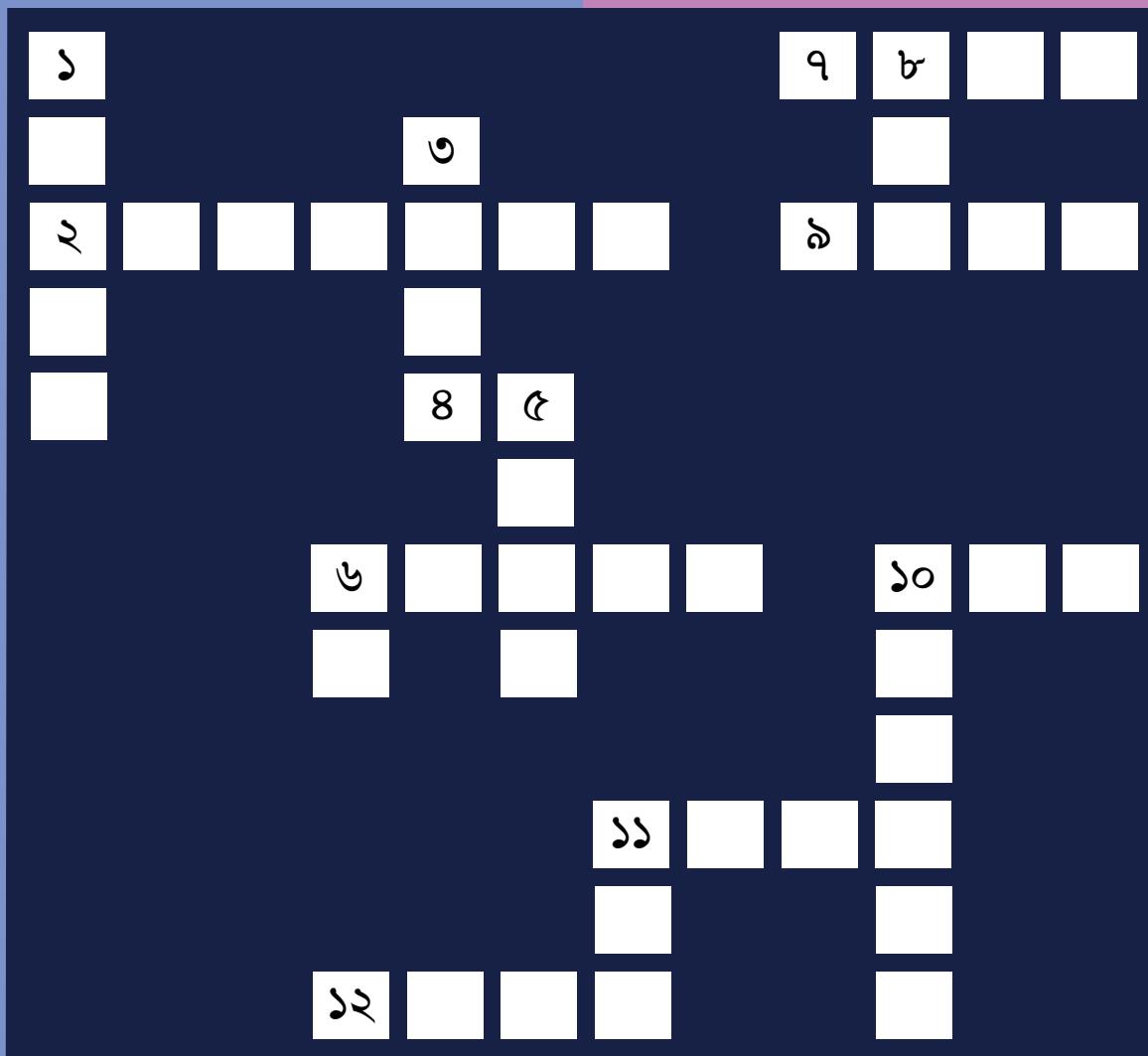
প্রতি রঙের puzzle এর পিসকে নির্দিষ্ট পথে গোলকধাঁধা পাড় করে puzzle টি পূর্ণ করো।



সর্বপ্রথম সঠিক উত্তরদাতার জন্য রয়েছে Apar's Classroom এর পক্ষ থেকে
আকর্ষণীয় পুরস্কার।

[Click here for instructions](#)

আমাদেরকে উত্তর পাঠাতে এখানে ক্লিক করো

**উপর-নিচ:**

- ১। রুই মাছের লেজ
- ৩। এবং ১ ব্যতীত অন্য কোন অক্ষ নেই যার
- ৫। বস্তুর স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থার আলোচনা
- ৬। বস্তুকে আনুভূমিকের সাথে তীর্যকভাবে নিষ্কেপ করলে তাকে _ বলে
- ৮। ৩০ তম হয়েছে যে
- ১০। কবি আল মাহমুদের লেখা একটি কাব্য
- ১১। কতগুলো চলমান বিন্দুর সঞ্চারপথ

পাশাপাশি:

- ২। যে রোগের একটি লক্ষণ ঘ্রাণশক্তিহীনতা
- ৪। যার ১২ জোড়া, গঠন করবে একটি খাঁচা
- ৬। জীববিজ্ঞানের একটি শাখা
- ৭। ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে “ফোটন” তৈরি করবে যা
- ৯। একটি শাস্ত্র যেখানে ভাষা বিশেষভাবে বিশ্লেষিত
- ১০। ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান
- ১১। মেরুদণ্ডের অস্থিখন্ড
- ১২। MgO -এর বন্ধন

ধাঁধা



১. পাল্লা আমার স্বল্প,
বলের মান অল্প,
বলি আমি ৩ নির্গমনের গল্প।

২. আগুন আমায় করে ভয়
গ্রিন হাউজ গ্যাস আমারে কয়।
আমি কে?

৩. একজন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন যার ব্যাস এক
মাইক্রো এবং প্রতি মিনিটে দুটি ব্যাকটেরিয়াকে বিভক্ত করে প্রজনন করে। দুপুর
১২টায়, সে একটি পাত্রে একটি একক জীব রাখে। ঠিক দুপুর ১টায় কন্টেইনার
ভর্তি হয়ে যায়। কোন সময়ে কন্টেইনার অর্ধেক ভর্তি ছিল?

৪. প্রকৃত কোষে পাবে সবে
কাঠামো গঠন করবেই তবে।

৫. দুটি ট্রেন বিবেচনা করুন যা ১০০ কিলোমিটার ব্যবধানে সরাসরি একে
অপরের দিকে যাচ্ছে। যদি প্রতিটি ট্রেন ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে চলাচল
করে, তাহলে দুটি ট্রেন কত দ্রুত মিলিত হবে?

৬. ভাসতে জানে, হাঁটতে জানে
মাথা তার নয়,
শরৎকালকে সে দিলো আঁড়ি
করতে শিকার চয়।

৭. এডওয়ার্ড সাহেবের মুখে খই
সে এক অবাক কথা,
ললিত করা নামের বাহার
অতি-আণুবীক্ষণিক সত্ত্বা।

৮. একটা পার্টিতে সবাই সবার সাথে হাত মেলালো। সেখানে ৬৬টি হ্যান্ডশেক হয়েছিল। পার্টিতে কয়জন লোক ছিল?

৯. বড় রাজার রাজত্বে
গোল মস্তকের খেলা,
ট্রোক্যান্টার নামের আজব বস্তু
প্রজাদের পথচলা।

১০. জানো? আমি তারা
হুঁয়ে দিলেই কণ্টকের দেখা,
হিমাল তন্ত্র সংবহনে ব্যস্ত
সমুদ্র আমার নিত্য সখা।

আমাদেরকে উত্তর পাঠাতে এই বাটনে লিঙ্ক করো

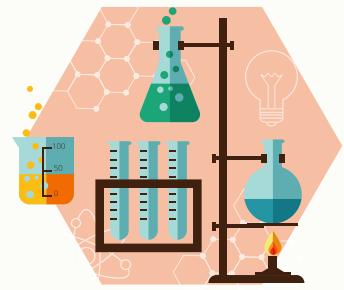


পদাৰ্থবিজ্ঞান



- ১। পৃথিবীৰ ভৱ M এবং ব্যাসাৰ্ধ R হলে, পৃথিবী পৃষ্ঠে GM এৰ অনুপাত হবে-
- a. Zero
 - b. One
 - c. infinity
 - d. Less than one
- ২। ২০০ ছিদ্ৰবিশিষ্ট একতি চাকতি প্ৰতি ঘণ্টায় কতবাৰ ঘুৱলে নিৰ্গত সুৱেৱ কম্পাঙ্ক 10 Hz হবে?
- a. 100
 - b. 50
 - c. 180
 - d. 200
- ৩। ফুটস্ট পানি বাস্পে পৱিণ্ট হচ্ছে, এ অবস্থায় পানিৰ আপেক্ষিক তাপ হবে-
- a. Zero
 - b. One
 - c. infinity
 - d. Less than one
- ৪। 4D পাওয়াৱেৱ একটি উত্তল লেঙ্গেৱ সাথে একটি 3D পাওয়াৱেৱ অবতল লেঙ্গ সংযুক্ত কৱা হলো। সমন্বিত লেঙ্গটিৰ ফোকাস দূৰত্ব হবে-
- a. 25 cm
 - b. 50 cm
 - c. 100 cm
 - d. 200 cm
- ৫। i এবং $4i$ প্ৰাবল্যেৱ দুটি তৱজিৰ ব্যতিচাৰ তৈৱি কৱে। গঠনমূলক ব্যতিচাৰ তৈৱিৰ প্ৰাবল্য হলো-
- a. $5i$
 - b. $7i$
 - c. $9i$
 - d. $4i^2$

রসায়ন



১। কোনটি সবচেয়ে দুর্বল প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া?

- a. ভ্যান্ডার-ওয়ালস আকর্ষণ বল
- b. হাইড্রোজেন বন্ধন
- c. সমযোজী বন্ধন
- d. দ্বিপোল আকর্ষণ

২। Lead (II) Dioxide কে দ্রবীভূত করতে কোনটি ব্যবহার করা যাবে?

- a. HNO_3
- b. H_2SO_4
- c. HCl
- d. Hot H_2O

৩। নিচের কোনটি শুষ্ক কোষে ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

- a. Zinc
- b. MnO_2
- c. Carbon
- d. NH_4Cl

৪। সমুদ্রের পানির ভিতর দিয়ে ক্লোরিন চালনা করে ব্রোমিন পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে কেন ব্রোমিন পাওয়া যায়? রাসায়নিক বিক্রিয়াটি লিখ-

৫। dsp^2 , sp^3d এবং sp^3d^2 হাইব্রিড অরবিটালগুলোর জ্যামিতিক বিন্যাস কি কি?

গণিত



১। $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(x - x^2)}}$ এর মান হবে-

২। $\sqrt{i} + \sqrt{-i}$ এর মান হবে-

৩। $\cos 2\theta = \frac{24}{25}$ হলে $\tan \theta$ এর মান কত?

৪। তিনটি একই রকমের বাস্তুর প্রতিটিতে দুইটি একই রকমের ড্রয়ার আছে। প্রথম বাস্তুর দুইটি ড্রয়ারের প্রতিটিতে একটি করে পেন্সিল, দ্বিতীয় বাস্তুর প্রতি ড্রয়ারে একটি করে কলম এবং তৃতীয় বাস্তুর একটি ড্রয়ারে একটি পেন্সিল ও আরেকটি ড্রয়ারে একটি কলম আছে। লটারীতে একটি বাস্তু নির্বাচন করা হলো ও নির্বাচিত বাস্তুর একটি ড্রয়ার খুলে পেন্সিল পাওয়া গেল। পেন্সিলটি যে প্রথম বাস্তুর, তার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।

৫। 6 জন ও 8 জন খেলোয়াড়ের দুটি দল থেকে 11 জন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট টিম গঠন করতে হবে যাতে 6 জনের দল থেকে অন্তত 4 জন খেলোয়াড় ঐ টিমে থাকে। টিমটি মোট কত প্রকারে গঠন করা যাতে পারে?

জীববিজ্ঞান



১। নিচের কোন প্রাণিতে গোলীয় প্রতিসাম্য দেখা যায় না?

- a. Volvox
- b. Heliozoa
- c. Hydra
- d. Radiolaria

২। লসিকানালি কত ধরনের হয়?

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5

৩। HIV রক্তের কোনটিকে আক্রমণ করে?

- a. গোহিত রক্তকণিকা
- b. শ্বেত রক্তকণিকা
- c. রক্তরস
- d. অগুচ্ছিকা

৪। ৫টি DNA ভাইরাসের নাম লিখ।

৫। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড কয়টি ও কি কি?

